সাহস শক্তি সক্রিয়তা

হিন্দু সংস্কৃতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

পূজা সংখ্যা আশ্বিন ১৪২১, সেপ্টেম্বর ২০১৪

স্বদেশ

সংহতি সংবাদ

সাহস ✪ শক্তি ✪ সক্রিয়তা

বিশেষ পূজা সংখ্যা ২০১৪ (আশ্বিন, ১৪২১ বঙ্গাব্দ)

হিন্দু সংহতি

সম্পাদক
বিকর্ণ নস্কর

প্রকাশক ও মুদ্রক
তপন কুমার ঘোষ

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা-৭০০০১২
ফোন ঃ ৭৪০৭৮১৮৬৮৬

মুদ্রণে
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং
২৩, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৬
ফোন ঃ ০৩৩ ২৩৬০ ৪৩০৬

প্রাপ্তিস্থান
বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য-১২ টাকা

ইন্টারনেটে হিন্দুসংহতি
<www.hindusamhati.org>,
<hindusamhatibangla.com>
<www.hindusamhatitv.blogspot.in>,
Email : hindusamhati@gmail.com

সূচীপত্র

আমাদের কথা		২
ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা গুলিয়ে গিয়েছে	তপন ঘোষ	৪
ইংরেজ তুমি ফিরে এসো....	নিহারণ প্রহারণ	৭
প্রসঙ্গ মহাভারত-দুটি প্রশ্ন	সুমন্ত্র মাইতি	১২
এই বিচারিতা আর কতদিন	দেবতনু ভট্টাচার্য্য	১৩
নিঃশব্দ আতঙ্ক	অম্বিকা গুহরায়	১৫
অবিশ্বাস্য	বিকর্ণ নস্কর	১৮
বিজেপি-তে মুসলিম অনুপ্রবেশ		২০
ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি		২১
১৬-ই আগস্ট হিন্দু সংহতির পদযাত্রা		২৫
পত্রিকা দপ্তর থেকে		২৭

কবিতা

জন্মভূমি	সুন্দরগোপাল দাস	১০
ব্যর্থতা	সমীর গুহরায়	১০
অঙ্গীকার	কার্ত্তিক দত্ত	১১

আমাদের কথা

ভারতে আসছে আলকায়দা, আর কতদিন আত্মপ্রবঞ্চনা?

তালিবান থেকে আই.এস.আই.এস., আলকায়দা থেকে লস্কর-ই-তৈয়বা---এই অসংখ্য মুসলিম সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলো আজ বিশ্ববাসীর সামনে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে এরা সন্ত্রাসবাদের জাল এমনভাবে ছড়িয়েছে যে এদের নিয়ন্ত্রণ করতে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স সহ চীনের মত শক্তিশালী দেশগুলিও নাস্তানাবুদ হয়ে যাচ্ছে। ভারতে আলকায়দা-র শাখা প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে বর্তমান সমস্ত রাষ্ট্রের সীমানা বিলোপ করে এক ইসলামিক রাষ্ট্রের স্থাপনা করা হবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, অন্ধের হাতি দেখার মত সবাই এই গভীর সমস্যাকে নিজেদের মত করে ব্যাখ্যা করছে। এই সমস্যার মূলে পৌঁছাতে হলে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকেই একে বুঝতে হবে। ইসলামি ধর্মীয় শিক্ষার বুনিয়াদ হচ্ছে কোরান ও হাদিশ। এই কোরান ও হাদিশের নির্দেশিত পথেই মুসলমানরা চলতে বাধ্য। যারা এই পথে চলবে না তাদের মুসলমান হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। এই মূলগত বিষয়টির যথাযথ জ্ঞান না থাকার কারণেই আমরা ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছি এবং তার খেসারত দেশ ও সমাজকে দিতে হচ্ছে।

রাজনীতিবিদরা মনে করছেন, বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের উচ্চাকাঙ্খাই এই সন্ত্রাসবাদের প্রেরণার উৎস। ভুল, ভুল, মহাভুল। ইসলামের সার্বজনীন ঘোষিত লক্ষ্য হল ''দারুল ইসলাম''। এর অর্থ সারা বিশ্বকে ইসলামের শাসনের অন্তর্ভুক্ত করা। ইসলামের এই ধর্মীয় শিক্ষার প্রেরণাতেই এই জেহাদী সন্ত্রাসবাদ। আল্লাহ-র প্রতি যাদের বিশ্বাস নেই তারা হল কাফের এবং এই কাফেরদের খতম করা অথবা এদের ধর্মান্তরিত করে ইসলামের আওতায় আনার জন্য যে যুদ্ধ তার নাম জেহাদ। এই জেহাদ এতই পবিত্র যে, কোন ব্যক্তি জীবনে একবারও 'নামাজ আদা' না করলেও যদি সে জেহাদে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি সরাসরি বেহেস্তে যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়ে যাবে। তাই এই পবিত্র জেহাদে যোগ দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের কাছে শুধুমাত্র কর্তব্য নয়, বরং অতি সযত্নে লালিত একটি স্বপ্ন। মহঃ আলী জিন্নাহ খুব সহজভাবে এই কথাটিই বলেছিলেন। এই কথারই মূলভাবটি ইসলামি ধর্মীয় শিক্ষার একটি স্তম্ভস্বরূপ যা স্থান, কাল নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মুসলমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মুসলিম চিন্তাবিদ জাকির নাইকের কথায়, moderate মুসলিম বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, আছে কেবল Practicing, Partly Practicing এবং Non Practising মুসলিমের অস্তিত্ব। পৃথিবীব্যাপী একটি দারুল ইসলামের স্বপ্ন প্রতিটি মুসলমানের মনের মধ্যে সযত্নে প্রতিপালিত হচ্ছে যাকে কেউ কোনদিন মুছে ফেলতে পারবে না। আর এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার মাধ্যম হচ্ছে তালিবান থেকে এবং ISIS, আলকায়দা, লস্কর-এ-তৈয়বা, বোকো হারাম, হামাস-এর মত অসংখ্য জঙ্গি সংগঠন।

সুতরাং এবিষয়ে মনের মধ্যে দ্বিমত থাকা উচিত নয় যে, বিশ্বব্যাপী এই মুসলিম সন্ত্রাসবাদের মূলে রাজনীতি নেই। এর মূল প্রেরণা হচ্ছে ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষা, ইসলামের থিয়োলজি। রাজনৈতিক সম্প্রসারণ হল তার বাহ্যিক প্রতিফলন মাত্র।

আমাদের দেশের ইতিহাসও এই তত্ত্বকে সমর্থন করে। ভারতে মুসলমান আক্রমণের পর আমরা দেখতে পাই যে মুসলমান শাসকরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেই ক্ষান্ত হয় নি। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পিছনে যদি শুধু রাজনৈতিক প্রেরণা থাকত তাহলে হাজার হাজার মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করার কী প্রয়োজন ছিল? লাখ লাখ হিন্দুকে হত্যা করে, ধর্মান্তরিত করে কোন্ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করেছিলেন মুসলিম শাসকরা? আধুনিক কালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হল। প্রতিষ্ঠিত হল মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান। ১৯৭১-এ ভারতের সৈন্যদের সহায়তায় পাকিস্তান ভেঙ্গে সৃষ্টি হল বাংলাদেশ। কিছুদিনের মধ্যে বাঙালি সেন্টিমেন্টকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইসলামকেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হল। আজ মুসলিম দেশগুলোর মধ্যেও মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা নাশকতা চালাচ্ছে, সরকারের বিরুদ্ধে লড়ছে। কেন? সেখানে আরও কট্টরভাবে শরীয়ত আইন প্রতিষ্ঠার জন্য। এ ব্যাপারে কোনরকম শিথিলতা তারা সহ্য করতে রাজি নয়। তাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠা নয়, সঠিক অর্থে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। শুধু মানুষকে হত্যা করা নয়, নিজেদের জীবন দিয়ে শহীদ হওয়ার ক্ষেত্রেও তারা পিছপা হচ্ছে না। এসব কি শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির প্রেরণায় হচ্ছে? কখনই নয়। এই কর্মকাণ্ড চলছে ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষার প্রেরণায়।

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশের নেতারা সেদিনও এই সত্যকে স্বীকার করার সৎ সাহস দেখাতে পারেন নি, আজও পারছেন না। আজও দেশবাসীকে বোঝানোর চেষ্টা চলছে যে শিক্ষার অভাব, অনুন্নয়ন, গরিবী এই সবই নাকি মুসলমান যুবকদের সন্ত্রাসবাদের রাস্তায় ঠেলে দিচ্ছে। সেজন্য সংখ্যালঘুদের জন্য প্যাকেজের বন্যা বইছে। মাদ্রাসার উন্নয়ন, একহাতে কোরান অন্য হাতে কম্পিউটারের প্রতিশ্রুতি, চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ সবই হচ্ছে। এতে মুসলিম সমাজের উন্নয়ন হবে সন্দেহ নেই এবং হওয়া উচিতও। কিন্তু এসবের মাধ্যমে কি একজন সাচ্চা মুসলমানের মন থেকে ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষাকে মুছে ফেলা যাবে? ভুলিয়ে দেওয়া যাবে তার দারুল ইসলামের চরম লক্ষ্যকে? ভেঙ্গে দেওয়া যাবে জেহাদের মাধ্যমে তার বেহেস্তে যাওয়ার স্বপ্নকে? অসম্ভব। তাই সত্যকে স্বীকার করার মত সাহস আজ আমাদের নেতাদের দেখাতেই হবে। রাজনৈতিক স্বার্থে অথবা দেশব্যাপী অশান্তি ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে সমঝোতার রাস্তায় হাঁটলে যত সময় পার হয়ে যাবে সমস্যা ততই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

পিছিয়ে চলেছে ২৬/১১ মামলা, চিন্তায় কেন্দ্র

২৬/১১ হামলার অভিযুক্তদের বিচার প্রক্রিয়া যত দ্রুত সম্ভব শেষ করার জন্য পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে অনুরোধ জানান নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু নওয়াজ দিল্লিতে এসে ভারত-পাক সুসম্পর্কের কথা বলে গেলেও মোদীর ওই অনুরোধ রেখেছেন বলে প্রমাণ মেলেনি। উল্টে এখন নওয়াজের গদিই টলমল করছে। এই অবস্থায় ২৬/১১-র পাণ্ডাদের দোষী সাব্যস্ত করার কাজ কত দূর এগোবে, তা নিয়ে চিন্তায় দিল্লি।

রাওয়ালপিণ্ডির বিশেষ সন্ত্রাস দমন আদালতে ২৬/১১ হামলার প্রধান অভিযুক্ত লস্কর-জঙ্গি জাকিউর রহমান লকভি-সহ সাত জনের বিচার চলছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সাত বার ওই মামলার শুনানি পিছিয়ে গিয়েছে। কখনও বিচারপতি ছুটিতে, কখনও সাক্ষীরা গরহাজির, কখনও আবার সরকারি আইনজীবি অনুপস্থিতির নানা কারণে মামলার শুনানি স্থগিত হয়েছে। ৩ সেপ্টেম্বরও শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানে চলতি অস্থিরতার কারণে সেই শুনানি হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

নিজের শপথে শরিফকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মোদী। ২৬মে শপথ নিয়ে পরেরদিনই নওয়াজের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিনি। বিদেশ মন্ত্রকের বক্তব্য, মোদী নওয়াজকে সাফ জানান যে, ২৬/১১-র অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্য ইসলামাবাদকে পদক্ষেপ করতে হবে। তা হলেই প্রমাণ হবে, ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে সত্যিই আগ্রহী পাকিস্তান।

এই বৈঠকের পরের দিন, ২৮ মে রাওয়ালপিণ্ডিতে ২৬/১১ মামলার শুনানি ছিল। মোদী-নওয়াজ বৈঠকের কী ফল মেলে, তা দেখার জন্য রাওয়ালপিণ্ডির দিকে চোখ রাখেন গোয়েন্দাকর্তারা। দেখা যায়, সরকারি আইনজীবিই অনুপস্থিত। ওই আইনজীবীরা যুক্তি দেন, জামাত-উদ-দাওয়ার তরফে তাঁদের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এই জামাত-উদ-দাওয়া হল আসলে লস্কর-ই-তইবার প্রকাশ্য সংগঠন। যার মূল মাথা মুম্বই-হামলার প্রধান ষড়যন্ত্রী হাফিজ সঈদ। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, চৌধুরী আজহারের নেতৃত্বে সরকারি আইনজীবীরা লিখিতভাবে আদালতে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেন। নিরাপত্তা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপই করা হয়নি।

শুধু ২৮ মে নয়, এরপর জুন মাসের ৪ ও ১৮ তারিখ, জুলাই মাসের ২ ও ২৩ তারিখেও সরকারি আইনজীবীরা অনুপস্থিত থাকায় শুনানি স্থগিত হয়ে যায়। ২৫ জুনও শুনানি ছিল। সে দিন আবার বিশেষ আদালতের বিচারপতি আস্তিকার রহমান ছুটিতে ছিলেন। এরমধ্যে মাত্র একবার, ১১ জুন কিছুটা আদালতের কাজ হয়েছিল। সেদিন দু'জন সাক্ষীর বয়ান নথিভুক্ত করা হয়।

রাওয়ালপিণ্ডির ওই আদালতে যে সাতজনের বিচার চলছে, তাদের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ নাম লস্কর-কমাণ্ডার জাকিউর রহমান লকভি। হামলা চলাকালীন পাকিস্তানে বসে টেলিফোনে সে-ই আজমল কাসভ ও তার সঙ্গীদের নির্দেশ দিচ্ছিল বলে অভিযোগ। লকভি ছাড়া বাকিরা হল আবদুল ওয়াজিদ, মজহর ইকবাল, জামিল আহমেদ, শাহিদ জামিল রিয়াজ, হামাদ আমিন সাদিক ও আনজুম। প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই ২৬/১১ হামলা ঘটানো, তার পরিকল্পনা তৈরি ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। মুম্বই হামলায় নিহত ১৬৬ জনের খুনের মামলাও ঝুলছে এদের নামে। সকলেই এখন রাওয়ালপিণ্ডির আদিয়ালা জেলে বিচারাধীন বন্দি। কিন্তু তাদের দোষী সাব্যস্ত করে শীঘ্রই শাস্তি ঘোষণা হবে, এমন কোন আশা দেখছে না দিল্লি।

ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা গুলিয়ে গিয়েছে

তপন কুমার ঘোষ

খুব দ্বিধা ও সংকোচের সঙ্গে এই লেখাটা শুরু করছি। কারণ লেখার বিষয়বস্তু 'ধর্ম কী?' হাতি ঘোড়া গেল তল, ব্যাঙ বলে কত জল। ধর্ম বিষয়ে ব্যাস-বশিষ্ঠদেব থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আলোচনা করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীচৈতন্য থেকে শুরু করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, রামতীর্থ, দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ, প্রণবানন্দ—এত বড় বড় মহাপুরুষ ও ধর্মবেত্তারা আলোচনা করেছেন। তারপর আমার মত এক অতি নগণ্য ব্যক্তি ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করার স্পর্ধা রাখে কী করে? তাই এই সংকোচ। আমি জানি, জ্ঞানীগুণী, বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই নগণ্য ব্যক্তি, এই অর্বাচীনের 'ধর্ম' বিষয়ে লেখা একটা লাইনও পড়বেন না। তাতে ক্ষতি নেই। কারণ, তাঁদেরকে ধর্ম বোঝানোর জন্য এই লেখা নয়। আজকের বাংলার যুবসমাজকে 'সঠিক ধর্ম কী' এবং 'ধর্মটা আসলে কী'—একথা বোঝানোর জন্যই এই লেখা। শুধু যুবকদের জন্য আমার এই লেখা উৎসর্গ করলাম।

ভাইসব, 'ধর্ম' শব্দটা শুনলেই সকলের মনে পূজা, ব্রত, পাঠ, মঠ, মন্দির, ঠাকুর, দেবতা, মূর্তি, মালা, তিলক, ভজন, কীর্তন, উপোস, জপ, যজ্ঞ—এই বিষয়গুলো স্মরণে আসে। তাই একজন ব্যক্তিকে চন্দনের তিলক কেটে গায়ে নামাবলী দিয়ে কোথাও যাচ্ছেন দেখলে মনে হয় যে উনি নিশ্চয় কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় কাজে যাচ্ছেন। একজন মহিলা স্নান করে লালপাড় শাড়ি পরে হাতে নৈবেদ্যের পিতলের থালা নিয়ে যাচ্ছেন। দেখলেই আমাদের মনে হয় যে মহিলাটি নিশ্চয় ধর্মের কোন কাজে যাচ্ছেন। তেমনি ঢাক ঢোল ঘণ্টা বাজিয়ে ঠাকুরপুজো হচ্ছে দেখলে তো মনে হয়ই যে ধর্মানুষ্ঠান হচ্ছে। ঠিক তেমনি আজকে ধর্মের একটা বড় রূপ হয়েছে—সংকীর্তন, নাম ও জপ। আমাদের বাংলা ও আসামে যজ্ঞ অনুষ্ঠানটা কম। বাকি ভারতে সেটাও প্রচুর। এগুলোকেই সমাজে সাধারণ মানুষ ধর্ম বলে মনে করে। আর তাতেই হয় যত বিপত্তি। আমার মত—ধর্ম সম্বন্ধে এই প্রচলিত ধারণাটিই আমাদের হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের অধঃপতনের মূল ও প্রধান কারণ। মুসলমান নয়, খ্রীষ্টান নয়, কম্যুনিস্ট নয়।

আমার যুবক বন্ধুরা, তোমরা এসব বিষয়ে কোন বক্তব্য বা প্রশ্ন নিয়ে জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত বয়োঃজ্যেষ্ঠ গুরুজন বা গুরুদেবদের কাছে যাও। তাঁরা রে রে করে উঠবেন। তাঁদের কাছ থেকে বহু শাপশাপান্ত গালাগালি তোমাদেরকে শুনতে হবে। কারণ, প্রশ্নতে এঁদের বড় অরুচি। এঁরা শুধু শ্রদ্ধা চান আর ভক্তি চান। এঁরা নচিকেতার কাহিনী জানেন। মানেন না। নচিকেতা একজন বালক হয়েও মৃত্যুর ওপারে কি আছে—যমের কাছে জানতে চেয়েছিল। শুধু চায়নি, জেদ করেছিল। এবং উত্তর জেনেছিল। 'তোমার ওকথা জানতে নেই'—যমরাজার একথা সে মানেনি। তাই নচিকেতাকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল 'কঠোপনিষদ'। অর্জুন কৃষ্ণের আদেশ এককথায় মেনে নিলে গীতা তৈরিই হত না। অর্জুনের শতখানেক প্রশ্নে ও শ্রীকৃষ্ণ বিরক্ত হননি। এমনকি অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের থিওরিটিক্যাল উত্তরে সন্তুষ্ট না হলে কৃষ্ণ তাকে প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশনও দিয়েছিলেন বিশ্বরূপ প্রদর্শনের দ্বারা। প্রশ্নোত্তরের ও তর্ক-মীমাংসার এরকম বহু উদাহরণ আমাদের শাস্ত্রে প্রচুর আছে। আদি শংকরাচার্যের কাজই ছিল বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক করা। সুতরাং, আমাদের হিন্দু ধর্মে, সনাতন ধর্মে, 'প্রশ্ন' অতি সম্মানিত, স্বীকৃত ও মর্যাদাপ্রাপ্ত। তাই যুবকভায়েরা, তোমরা ধর্ম বিষয়ে যে কোন প্রশ্ন নিয়ে যদি কোন জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত বা গুরুর কাছে যাও, এবং তিনি যদি বিরক্ত হন ও উত্তর দিতে অস্বীকার ক'রে শুধু বিশ্বাস করতে বলেন ও কেবল মেনে নিতে বলেন—তাহলে জানবে যে তিনি আমাদের মহান ধর্মের শ্রেষ্ঠ পরম্পরার অনুগামী নন। তাঁর কাছে ধর্ম শিখবে না।

আগে যে কথা বলেছি, পূজা, মালা, তিলক, কাঁসর, ঘণ্টা এগুলোকেই শুধু ধর্ম মনে করা চরম ভুল, আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ। এগুলি আমাদের ধর্মের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। এগুলি আমাদের ধর্মের প্রধান জিনিস নয়, মূল বস্তু নয়। ক্ষুদ্র অংশকেই সব মনে করার ফলে যা বিপর্যয় হতে পারে, তাই হয়েছে। একটা উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করি। গ্রামের একটা বড় বিয়েবাড়ি। অনেক লোক খাবে। রান্নাবান্না ও পরিবেশনের বিরাট আয়োজন হয়েছে। একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যেখানে খাওয়াদাওয়া হবে—সেখানে জল ছেটানোর, যাতে ধুলো না ওড়ে। সে এত উৎসাহী যে খাওয়ার জায়গায় জল ঢেলে কাদা করে দিল, সব খাবারদাবারের উপরেও প্রচুর পরিমাণে জল ছিটিয়ে দিল। সব খাবার নষ্ট হল। আয়োজন পণ্ড। কেন এমন হল? কারণ, ধুলো মারতে জল ছেটানো যে বৃহৎ আয়োজনের একটা ক্ষুদ্র অংশ একথা বুঝতে

না পেরে সে ওটাকেই কাজের বাড়ির একমাত্র কাজ বা প্রধান কাজ বলে মনে করে সব আয়োজন নষ্ট করে দিল।

আমাদের ধর্মের হয়েছে ঠিক সেই অবস্থা। পূজা-পাঠ, নাম-কীর্তন, ধূপ-ধুনোকেই ধর্ম বলে মনে করায় আসল ধর্ম হারিয়ে গেছে, ধর্মের মূল আয়োজন, মূল ব্যবস্থা সব পণ্ড হয়ে গেছে। আমাদের সেই মূল ধর্ম, মূল ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেছে বলেই অহিন্দু বা সনাতন ধর্ম বিরোধীদের কাছে আমরা বার বার হচ্ছি পর্যুদস্ত, পরাস্ত, অপমানিত, আমাদের ভূমি হচ্ছে ছোট, আমরা নিজ মাটি থেকে হচ্ছি বিতাড়িত। গলায় মালা চন্দন, আর কপালে 'রিফিউজি' এই লজ্জার চিহ্ন একসঙ্গে শোভা পাচ্ছে। তাহলে মূল ধর্মটা কী? এটা বোঝা খুব কঠিন নয়। কিন্তু প্রায় হাজার বছর ধরে আমাদের তথাকথিত ধর্মীয় গুরুরা, পণ্ডিতরা ও 'ইস্পেশাল' মর্যাদা দাবী করা ব্রাহ্মণেরা এটাকে গুলিয়ে দিয়েছেন। এখনও ধর্মের ধ্বজাধারীরা, কথাকার, প্রবচনকার ও গুরুঠাকুররা গুলিয়ে দিচ্ছেন। তাই সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারছে না—আসল ধর্মটা কী? মালাতিলক পরে বা না পরে, কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে বা না বাজিয়ে—যে যেমনভাবে পারে ভগবানকে একমনে ডাকাটাই কি ধর্ম? না তাও নয়। সেটাও মূল ধর্ম নয়, ধর্মের প্রধান অংশ নয়। ধর্মটা তাহলে কী?

আচ্ছা, এই শব্দগুলির সঙ্গে কি সাধারণ মানুষ খুব অপরিচিত?—সংসার ধর্ম, গার্হস্থ্য ধর্ম, পিতৃধর্ম, পুত্রধর্ম, পতিধর্ম, পত্নীধর্ম, ধর্মশালা, ছাত্রধর্ম, ধর্মকাঁটা, যৌবনধর্ম, ধর্ম অস্পাতাল (বাংলায় নেই, সারা ভারতে আছে), যুগধর্ম, প্রজাধর্ম, ক্ষাত্রধর্ম এবং আজকের রাজনীতিতে বহুল প্রচলিত শব্দ 'রাজধর্ম'। এরকম আরও বহু আছে। এই যে এতগুলি শব্দের সঙ্গে 'ধর্ম' শব্দটি যোগ হয়ে সমাজে প্রচলিত হয়েছে—এতগুলি 'ধর্ম' শব্দ তো মালা তিলক, নাম-জপ, মঠ মন্দিরের সঙ্গেও যুক্ত নেই। তাহলে এগুলোকেই কেন প্রধান ধর্ম বলে মনে করা হয়? এই যে উদাহরণগুলো ঃ সংসার, গার্হস্থ্য, পিতৃ, পুত্র, পতি, পত্নী, ছাত্র, ক্ষাত্র, যুগ, যৌবন, রাজা, প্রজা, কাঁটা (মালবোঝাই লরি ওজনের যন্ত্র), হাসপাতাল, ধর্মশালা—এতগুলো শব্দের সঙ্গে যে ধর্ম আছে—এই ১৫টি শব্দের কোনটাতেই তো নাম-জপ, কাঁসর ঘণ্টা, ধূপ, ধুনো, মন্ত্র, তন্ত্র, আহ্নিক কিছুই নেই। তাহলে ধর্ম বলতে এগুলো সব বাদ, অথচ এগুলোই শুধু ধর্ম হয়ে গেল কী করে?

আমাদের সমাজে এতগুলি শব্দের সঙ্গে 'ধর্ম' শব্দটি যুক্ত হয়েছে, কারণ, এগুলোই হচ্ছে সমাজের সর্বসাধারণের জন্য করণীয় আসল ধর্ম, প্রধান ধর্ম। এই প্রত্যেকটি শব্দ দ্বারা এক একটি কর্তব্য বা ভূমিকাকে বোঝানো হয়েছে। আরও স্পষ্ট করে বললে—একটি নির্দিষ্ট ভূমিকায় সুনির্ধারিত কর্তব্যের নাম ধর্ম। উদাহরণ ঃ একটি ১২ বছরের বালক ভোর পাঁচটায় উঠে পড়তে বসল—সে তার ছাত্রধর্ম পালন করছে। বেলা সাড়ে আটটার সময় মা বলল, খোকা, ঘরে সরষের তেল ফুরিয়ে গিয়েছে, দোকান থেকে এক কিলো তেল নিয়ে আয়। ছেলেটি উত্তর দিল, না মা, আমার পড়ার ক্ষতি হবে, আমি এখন দোকান যেতে পারব না, অন্য কাউকে পাঠাও। ছেলেটি তার পুত্রধর্ম পালন করল না। ছাত্রধর্ম পালন করল, কিন্তু পুত্রধর্ম থেকে বিচ্যুত হল। এখন এই বালকটিকে শিক্ষা দিতে হবে যে, কোন্ ধর্ম কখন কোথায় কতটা পালন করতে হবে। এই শিক্ষার নাম ধর্মশিক্ষা, শুধু গীতার শ্লোক মুখস্থ করানোটা ধর্মশিক্ষা নয়।

সুতরাং এককথায় কর্তব্যই হচ্ছে ধর্ম। পিতার কর্তব্য পিতৃধর্ম, মাতার কর্তব্য মাতৃধর্ম, গৃহস্থের কর্তব্য গার্হস্থ্যধর্ম, রাজার কর্তব্য রাজধর্ম, প্রজার কর্তব্য প্রজাধর্ম। প্রতিবেশীর কর্তব্য প্রতিবেশীধর্ম, সমাজের প্রতি কর্তব্য সমাজধর্ম, যুগের কর্তব্য যুগধর্ম। বোঝা খুব কঠিন হচ্ছে কি? এটা না বুঝিয়ে আমাদের গুরুঠাকুররা শুধু মুক্তি মুক্তি মুক্তি, ভক্তি ভক্তি ভক্তি করে কান ঝালাপালা করে সাধারণ মানুষকে তার আসল ধর্ম, অর্থাৎ কর্তব্যধর্মটাই ভুলিয়ে দিয়েছেন, গুলিয়ে দিয়েছেন—খুব সৎ উদ্দেশ্যে নয়।

অথচ আমাদের শাস্ত্র পুরাণে খুব স্পষ্ট করে বারবার বলা হয়েছে। শিবিরাজার গল্প—শরণাগত পায়রাটিকে আশ্রয় দেওয়াটাই ধর্ম, সেই ধর্ম রক্ষা করতে শিবিরাজা নিজের উরু থেকে পায়রার ওজনের সমান মাংস কেটে দিলেন। আছে মহাভারতে ধর্মব্যাধের গল্প, যেখানে পতিব্রতা নারীকে ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যাধকে একজন তপস্বীর থেকেও অধিক ধার্মিক বলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আছে নারায়ণ, নারদ ও কৃষকের গল্প। যেখানে স্বয়ং নারায়ণ নারদের হাতে তেলের বাটি দিয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন যে সারাদিন নারায়ণের গুণগান করা নারদের থেকেও দিনে মাত্র দু'বার হরির নাম নেওয়া পরিশ্রমী কর্তব্যপরায়ণ কৃষক নারায়ণের বড় ভক্ত। রাম পিতৃসত্য রক্ষা করতে সত্যধর্ম পালনের জন্য বনে যাচ্ছেন, রাজধর্ম পালনের জন্য সীতাকে পরিত্যাগ করছেন, আবার পতিধর্ম পালনের জন্য পুরোহিতের আদেশ সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিবাহ না করে সোনার সীতা পাশে বসিয়ে যজ্ঞ করছেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে বারংবার তিরস্কার করছেন সে ক্ষাত্রধর্ম বিচ্যুত হচ্ছে বলে। এগুলো ধর্ম নয়? এগুলোই ধর্ম। এইসব না শিখিয়ে গুরুঠাকুররা শেখাচ্ছেন—মুক্তিলাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য,

ভগবদ্‌প্রাপ্তি, ভববন্ধন মোচন—এগুলোই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আর কী করে এগুলো হবে? শুধু গুরুভক্তি দিয়ে আর গুরুর কৃপায় হবে। তাই নিজের বৌ ছেলেমেয়ে, মা বাবা, ঘর সংসার সব ভুলে শুধু গুরুর চরণ ধর। গুরু তোমাকে ভবসাগর পার করে দেবেন। এই গুরুঠাকুররা আমাদের শাস্ত্রের নির্দেশ চতুর্বর্গ বা চার পুরুষার্থের কথা জানেন? মনুষ্য জন্ম নিয়েছ যখন, তখন তোমাকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থ পালন করতে হবে। মোক্ষের কথা ভাববে জীবনের চতুর্থ পর্যায়ে গিয়ে। অর্থাৎ সংসারের সব কর্তব্য সম্পূর্ণ করে, এমনকি বাণপ্রস্থ অবস্থায় সামাজিক কর্তব্য পালন করে, যখন আর কোন কর্তব্য বাকি নেই, তখন শুধু সারাদিন ভগবদ্‌চিন্তা করবে, মোক্ষ বা মুক্তির কথা ভাববে। তার আগে ভাবলে সব অনর্থ হবে। এই গুরুঠাকুররা কি জানেন না যে শাস্ত্রে বারবার বলা হয়েছে গার্হস্থ্য আশ্রম শ্রেষ্ঠ আশ্রম, এই গার্হস্থ্য আশ্রমই বাকি তিন আশ্রমের আধার। এই গুরুঠাকুররা কি জানেন না আমাদের মহান শাস্ত্রের সেই বিখ্যাত শ্লোক—"ধৃতি ক্ষমা দম অস্তেয় শৌচম্‌ ইন্দ্রিয় নিগ্রহম্‌; ধীর্বিদ্যা সত্যম্‌ অক্রোধ দশকং ধর্মলক্ষণম্‌।" ধর্মের এই শাস্ত্রোক্ত দশটি লক্ষণের মধ্যে পূজাপাঠ, নামজপ, ভগবদ্ভক্তি এসব কোথায় আছে? শাস্ত্রের এই ধর্মের ব্যাখ্যা কি ভুল?

এসব জানা সত্ত্বেও গুরুঠাকুরা সাধারণ ভক্তিমান ধর্মপ্রাণ মানুষকে সংসারবিমুখ, সমাজবিমুখ করে দিচ্ছেন। ফলে তারা তাদের কর্তব্য করছে না। তার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে চরম বিশৃঙ্খলা। আর এই কর্তব্যহীনতা ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিচ্ছে বিধর্মীরা, সনাতন ধর্ম বিনষ্টকারীরা। এক মন্দিরে যাওয়া ভক্ত যখন শোনে যে একমাইল দূরে ঐ দেবতারই আর একটা মন্দির ভাঙছে কিছু বিধর্মীরা, তখন এই ভক্তটি সেখানে ছুটে যাওয়ার কর্তব্য অনুভব করে না। সে তখন এই মন্দিরেই দেবতাকে আরও ২৫ বার বেশী করে কপাল ঠুকে প্রণাম করাটাই সংকটমোচনের একমাত্র উপায় বলে মনে করে। কারণ, কোন গুরু-পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ তাকে শেখায়নি যে বিধর্মীর হাত থেকে মন্দির রক্ষা করতে লাঠি হাতে ছুটে যাওয়াটা ধর্ম। ওই সময় নাম জপ করাটা অধর্ম। এই শিক্ষা নেই বলেই সারা বিশ্বে হিন্দুর মন্দির ভাঙে, মূর্তি ভাঙে, দেবদেবী হয় ব্যাঙ্গের শিকার, হিন্দু নারী হয় গণধর্ষিতা, তবু ভক্তদের হাতের জপের মালা নামে না থামে না, হাতে তন্য কিছু ওঠে না। এরা ভাবে, সবই হরির ইচ্ছায় হচ্ছে। হরিই বাঁচাবেন। এরা নির্বোধ। আমাদের ধর্মের কুশিক্ষা এদেরকে নির্বোধ করেছে। আর এই কুশিক্ষাতে এরা কাপুরুষে পরিণত হয়েছে। হরি কাউকে বাঁচান না। এরা হরির কার্যপ্রণালী কিছুই বোঝে না। সত্যযুগে হরি প্রহ্লাদকে বাঁচিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বাপরে কৃষ্ণ তাঁর প্রিয়সখা অর্জুনদের বাঁচানোর জন্যও নিজে একবারও অস্ত্র ধরেন নি। ওদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন—নিজের লড়াই নিজে লড়। আবার এই কৃষ্ণই—তাঁর উপর যত অত্যাচার, অপমান, আক্রমণ হয়েছে, তার প্রতিকারে অর্জুন ভীমকে ডাকেন নি। সে লড়াইগুলো তিনি নিজে লড়েছেন। পুতনা, অঘাসুর, বঘাসুর, কংস, শিশুপাল—এদেরকে নিজের হাতে মেরেছেন, অন্যের সাহায্য নেননি। অথচ দুঃশাসন, দুর্যোধনকে মারার সময় ভীমকে ইশারায় দেখিয়ে দিয়েছেন, নিজের হাতে গদা তুলে নেননি। সেই কৃষ্ণ এখন হিন্দুর মন্দির ভাঙলে, হিন্দু নারীর ইজ্জত লুণ্ঠিত হলে বাঁচাতে আসবেন? তিনি আসেননি ১৯৪৬, ৪৭, ৫০, ৬৪, ৭১ সালে কিংবা ২০০১ সালে ঐ হরিভক্তদের পূর্ববঙ্গে। এই হরিভক্তরা হরির নামের লজ্জা। কাপুরুষ কখনো কৃষ্ণভক্ত হতে পারে না।

ঠিক এইরকম নিষ্ক্রিয়তা, সংসার বিমুখতা, সামাজিক কর্তব্যহীনতা ও passivity ভারতে তৈরি হয়েছিল বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ফলে। এর সুদূরপ্রসারী কুফলের কথা দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন অষ্টম শতাব্দীতে আদিগুরু শঙ্করাচার্য্য। তখন দেশসুদ্ধ লোক বৌদ্ধবিহারগুলিতে চলে যাচ্ছে ভিক্ষু আর ভিক্ষুণী হতে। দেশ ও সমাজের সমস্ত ব্যবস্থাগুলি পড়ছে ভেঙে। শঙ্করাচার্য্য বুঝতে পেরেছিলেন এর ফলে যেমন সৃষ্টি হবে সামাজিক অত্যাচার, তেমনি ভেঙে পড়বে দেশরক্ষা ব্যবস্থা। তাই তিনি সারা দেশ ভ্রমণ করে পুনরায় সনাতন ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাধারণ মানুষকে বৌদ্ধধর্মের সংসার বিমুখতা ও কর্তব্যহীনতা থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন সনাতন ধর্মের ব্যবস্থায়। শঙ্করাচার্য্যের সেই দূরদৃষ্টি, পৌরুষ ও সক্রিয়তার ফলেই এ দেশটা বেঁচে গিয়েছে। আজকের আফগানিস্তান ও পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবের ফলেই ওই এলাকাগুলি সহজেই ইসলামের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। ওই দুই জায়গাতেই আজ তালিবান, জামাত ও হুজিদের বাড়-বাড়ন্ত।

আমাদের হিন্দু সমাজের বর্তমানে এই চরম নিষ্ক্রিয়তা, চরম passivity-র জন্য শুধু সাধারণ মানুষ ও ভক্তরাই একমাত্র দায়ী নয়। দায়ী যারা সাধারণ মানুষকে ধর্মের মূল শিক্ষাটা গুলিয়ে দিয়ে কর্তব্যধর্মটা ভুলিয়ে দিয়েছে তারা। আজকের এই বিপন্ন বাঙলায় হিন্দু যুবকদের উদ্দেশ্যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম ও কর্তব্যধর্ম সম্বন্ধে আমার এটুকুই নিবেদন।

''ইংরেজ তুমি ফিরে এসো...., দাসত্বে আমার জন্মগত অধিকার...।''

নিহারণ প্রহারণ

আমাদের ভুল হয়ে গেছে...। ভীষণ ভুল হয়ে গেছে...বিরাট অন্যায় করেছি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তুমি যদি এ পোড়া দেশে না পা রাখতে, তবে এই দেশ আরেকটি আফগানিস্তান হত, আর আমি এতক্ষণে কলেমা পড়ে শেখ নিহারুদ্দিন হতাম আর আমার স্ত্রী কালো বোরখার তলায় থেকে অন্ততঃ হাফ ডজন ইসলামের বংশধর প্রতিপালন করতেন। ১০০ শতাংশ খাঁটি ''দার উল ইসলাম'' হত এই দেশ।

''ইংরেজ এই দেশের আশীর্বাদ''—বুঝেছিলেন রাজা রামমোহন রায়, বুঝেছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সহ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সবাই এটাই বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন—তৎকালীন বাংলার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ভারতীয় রেনেসাঁসের অগ্রদূত বঙ্গীয় হিন্দু সম্প্রদায় এবং তৎকালীন কলকাতার জমিদার সম্প্রদায়।

এটা বুঝেছিলেন বলেই এরা কেউ ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি। (রাজা রামমোহন রায় অবশ্য এই পূর্বেই দেহত্যাগ করেছিলেন। তিনি মুঘল বাদশাহের (আকবর-দুই) দেওয়া ''রাজা'' উপাধি একসময়ে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু আজও তার নামের পূর্বে ''রাজা'' উল্লেখ করা তাকে একপ্রকার অপমান করার সমান। তিনি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আগমনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলেই বিশ্বাস করতেন।)

তারা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন বলেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষে হিন্দুরাই হিন্দুদের বড় শত্রু। আত্মরক্ষা সহ হিন্দুত্ব রক্ষা করতে তারা চূড়ান্ত অসমর্থ। তাইতো তারা কখনই চাননি যে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ থেকে অপসারিত হয়ে, সেই স্থানে পুনরায় ইসলামের আধিপত্য স্থাপিত হোক।

শিখেরা মুসলমানেদের চিনেছিলেন হাড়ে হাড়ে...। এ তাদের সুদীর্ঘ আত্মবলিদানের পরীক্ষিত উপলব্ধি। সেই কারণেই পাঞ্জাবকেশরী রণজিত সিং বা তার পুত্র দলীপ সিংজির শিখ সাম্রাজ্য অধিগ্রহণের মাত্র কিছু বছর পরেই সারা ভারতব্যাপী ১৮৫৭-এর সিপাই বিদ্রোহে শিখ রাজন্যবর্গ ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। শুধু তাই নয় গোর্খারাও ইংরেজদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সেইদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে শুধু বাঁচিয়েছে—তাই নয় আরও ৯০ বছর সদর্পে এই দেশে রাজত্ব করতে সাহায্য করেছে। সেই ভুলটাই করলেন পরবর্তী কালে বঙ্গীয়, পাঞ্জাবি এবং মারাঠি হিন্দু সম্প্রদায়। ''পূর্ণ স্বাধীনতা চাই'' বলে তাঁরা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কাদের জন্য স্বাধীনতা? প্রকৃত দেশবাসী কারা? কারা ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি বলে মনে করে?—হিন্দুত্বের শক্তি ছাড়া ভারতবর্ষের অস্তিত্ব রক্ষা কি সম্ভব? এই সব না বুঝেই ক্ষণিক আবেগ আর কল্পনার দিবাস্বপ্ন নিয়ে তারা মরণ পণ করলেন। ফল কী হল?

যে হিন্দুর ব্রিটিশ বন্ধু হিসেবে থাকার কথা ছিল—খামোকা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে শত্রুতে রূপান্তরিত হল। ৮০০ বছর মুসলমানের শাসনে চরম নির্যাতনের ইতিহাস অস্বীকার করে ভণ্ড সেক্যুলারিজমের পাঁচন খেয়ে মুসলমানকে...ভাই-বন্ধু মনে করতে শুরু করল। অপর দিকে মুসলমান ধীরে ধীরে ইংরেজদের আস্থাভাজন হতে শুরু করল।

ব্রিটিশের বিরাগভাজন হয়ে পুনরায় উক্ত হিন্দুর কপালে জুটল অশেষ লাঞ্ছনা গঞ্জনা আর সীমাহীন অপরিমেয় অত্যাচার। দেশের জেলখানাগুলি হিন্দু রক্ত-মাংসের গন্ধ আর আর্তনাদের শব্দে প্লাবিত হতে লাগল। ফাঁসির মঞ্চে তারা জীবনের জয়গান গেয়ে গেলেন। একমাত্র উত্তরপ্রদেশের আস্ফাকউল্লা খান ছাড়া আর অন্য কোন মুসলমান ভারতের বিপ্লবে জীবন দান করেছেন বলে ইতিহাসে পাওয়া যায় নি।

অপরদিকে ব্রিটিশকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে মুসলমান হয়ে উঠল তাদের বন্ধু। ১৯০৫ সালের বঙ্গবিভাগ ছিল তারই একটি সুসংহত পদক্ষেপ। ইতিহাস সাক্ষী—এর পিছনে ''মুসলিম লীগ''-এর প্রতিষ্ঠাতা ঢাকার নবাব জনাব সলিমুল্লাহ খান-এর কতটা প্রভাব ছিল। তখনকার দিনের প্রায় সমস্ত দেশীয় অত্যাচারী জেলার, এবং পুলিশ পদাধিকারী ছিলেন এই মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। ব্রিটিশও যে ব্রিটিশ, তাকেও হিন্দুর পেটের কথা বার করার জন্য হিন্দু কয়েদীদের মুসলমানের হাতে ছেড়ে দিতে হত, পাছে হিন্দু অফিসার কোন পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেন (উদাহরণ—শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' গ্রন্থের সব্যসাচী এবং নিমাইবাবু)। শেষমেশ পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়াল যে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যে কোন ধরণের অভিযানে মূলতঃ মুসলমান অফিসারদেরই প্রাধান্য দেবার রেওয়াজ শুরু হল। এবং সত্যি কথা বলতে কি, ব্রিটিশের এই নীতি সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ

হয়েছিল। এবং শুধু কি তাই? সাধারণ গুপ্তচর বা পুলিশ ইনফর্মার হিসেবে মুসলমান সম্প্রদায় স্বয়ং ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এইভাবে সারা ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়ার পরিণাম স্বরূপ পরবর্তীকালে আর তেমন কোন বিপ্লব সংগঠিত হতে দেখা যায় নি।

এই নরপিশাচের দল সেই দিনও হিন্দু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছিল। তথ্য সংগ্রহের নামে মহিলাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করেছিল সেই দিনের প্রায় সমস্ত মুসলমান পুলিশ অফিসারেরাই। —ইতিহাস বড় ভয়ানক। বড় বেদনাদায়ক। সেইদিন লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ভগত সিং-দের উপর অত্যাচার করেছিলেন কারা? মেদিনীপুরের কুখ্যাত হিজলী জেলে বিচারাধীন বন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করতেন কারা? আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেলে উল্লাসকর...বীর সাভারকরদের উপর অসহনীয় নির্যাতনের নায়ক ছিলেন কারা? আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কয়েদীকক্ষে কান পাতলে আজও তাদের বর্বর নারকীয় আচরণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তারা কোন্ সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন? পাঠকবর্গের কাছে ইতিহাসের পাতায় এই সংক্রান্ত তথ্যাদি আহরণের জন্য বিনম্র নিবেদন রাখলাম।

এই সমস্ত দেশবরেণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের দল অকারণে অসময়ে খসে পড়ল। শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গরিমা, বংশমর্যাদায়, বিত্ত বৈভবে এদের সমকক্ষ পাওয়া আজও সাধারণ জনমানসে চরম বিস্ময়ের বিষয়!!! হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের। মাস্টারদা সূর্য সেনও সেই একই ভুল করেছিলেন। তিনি যে সময় 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিক আর্মি' তৈরি করেছিলেন, সেই সময় অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশের মুসলিমরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। স্বাভাবিকভাবেই কোন দেশের জাতীয় বিপ্লবে সংখ্যাগরিষ্ঠরাই অংশগ্রহণ করেন। দুঃখ হলেও সত্যি যে তাঁর দলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া দূরে থাক, একজনকেও দেখতে পাওয়া যায়নি। শুধু তাই নয়, এক মুসলমানের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর ধরা পড়ার বিষয়টিও নিশ্চয় পাঠকবর্গের অজ্ঞাত নয়। হয়তো বিতর্কের বিষয়, তবু কেন জানিনা মনে হয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর শেষ সফরসঙ্গী কর্ণেল হবিবুর রহমানের জায়গায় অন্য কোন হিন্দু অফিসার থাকলে ভারতের ইতিহাসটাই হয়তো অন্যরকম হতে পারতো। এ সব নিয়ে এবার সত্যই ভাবনাচিন্তা করার সময় এসে গিয়েছে।

ইতিহাসের পাতায় নেহেরু-গাঁধী ঘেঁষা বিভিন্ন ভারতীয় ঐতিহাসিকের দল (বিপান চন্দ্র, রোমিলা থাপার, তপন রায়চৌধরী, ইরফান হাবিব ইত্যাদি) বিভিন্নভাবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ আত্মত্যাগের ফানুস উড়াবার চেষ্টা করলেও তৎকালীন বিদেশী ঐতিহাসিকদের বক্তব্য ও বিভিন্ন প্রামাণ্য দলিল দস্তাবেজ তাদের সেই দাবীর অসাড়তাই প্রমাণ করে।

আরেকটি ভ্রান্ত ধারণা—গান্ধী সহ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলেই নাকি আমাদের স্বাধীনতা এসেছে। প্রথম কথা স্বাধীনতা কেউ কাউকে স্বেচ্ছায় দেয় না। তা ছিনিয়ে নিতে হয়। আমাদের ক্ষেত্রে তা আদৌ হয়নি। এই কারণেই কম্যুনিস্টরা এককালে স্লোগান দিতেন "এ আজাদি ঝুটা হ্যায়"।

পরিশেষে হিন্দুর বহু আত্মত্যাগের শেষ পর্যায়ে যখন স্বাধীনতা প্রাপ্তির বিষয়টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল সেই সময় ব্রিটিশকে বন্ধু বানানোর সুবাদে ১৯৩৪ সালে চৌধুরী রহমত আলীর প্রস্তাবিত পাকিস্তান...মাত্র ১৩ বছরের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে সব্বাইকে তাক লাগিয়ে দিল।

অত্যন্ত তাৎপর্যের বিষয় এই যে, —১৯৪৭ সালে অবিভক্ত ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষকে তিন খণ্ডে ভাগ করেন। তাদের মূল বক্তব্য ছিল তারা হিন্দুদের সঙ্গে থাকতে পারবেন না, তাদের ধর্মবোধ আলাদা। —জয় পরাজয় বোধ আলাদা। তাদের আলাদা 'হোম ল্যাণ্ড' চাই। সেই সময় অবিভক্ত ভারতে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৯ কোটি। জনসংখ্যার অনুপাতে তারা ছিলেন ২৩ শতাংশ। আবার এই ২৩ শতাংশ মানুষের মধ্যে ৯৫ শতাংশ মানুষ সেদিন পাকিস্তানের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। তখন আরবের তেলের রমরমা ছিলনা, তাই তাদের হাতে পেট্রো ডলারও ছিল না। ছিল না তেমন কোন মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। শুধুমাত্র লাঠি, ছুরি, তলোয়ার...আর গায়ের জোরেই 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' করে তারা সেইদিন আমাদের এই দেশমাতৃকাকে তিন খণ্ড করে দিল। কোটি কোটি হিন্দু উদ্বাস্তু হল। লক্ষ লক্ষ হিন্দু মেয়ে হল ধর্ষিতা। একটি হিসেব মতে দিল্লীর করোলবাগ হাসপাতালে প্রায় ৭৫,০০০ শিশুকে গর্ভপাত করিয়ে বিনিষ্ট করা হয়েছিল সেদিন...।

আর আজ আরবের তেলের রমরমা, তার সঙ্গে পেট্রো ডলারের উপচে পড়া ভাণ্ডার, আর ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা? আনুমানিক ২০ কোটি ছুঁই ছুঁই (ইন্দোনেশিয়ার পর পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার দেশ। যদিও ২০১১ এর আদমশুমারির সম্প্রদায়গত জনবিন্যাসের হার এখনও আমাদের নাগালের বাইরে। পূর্ববর্তী কংগ্রেস সংসারের কাছে আর.টি.আই. করেও ২০১১-এর মুসলিম জনসংখ্যার হিসেব পাওয়া যায়নি।)

সার্বিক জনসংখ্যার অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গে তারা প্রায় ৩২ শতাংশ। বর্তমানে তাদের হাতে মারাত্মক ও অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র। বিভিন্ন জেহাদি গ্রুপ—লস্কর- ই-তৈবা, জৈশ-এ-মহম্মদ, জামাত, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, সিমি-র রমরমা। সর্বোপরি পারমাণবিক শক্তিধর পাকিস্তানের সক্রিয় উপস্থিতি। এর সঙ্গে আমাদের ভণ্ড সেক্যুলার রাজনীতিবিদের নির্লজ্জ মুসলিম তোষণ। লাভ জেহাদ-এর মাধ্যমে হিন্দু মেয়েদের বিয়ের মাধ্যমে মুসলমান বানানো, অবৈধ মুসলিম অনুপ্রবেশ। মুসলিম বহু বিবাহ, ---অনিয়ন্ত্রিত জন্মহার, লোভ বা ভয় দেখিয়ে ধর্মান্তরকরণ-এইসব ঘটনার পরে কী মনে হয়?

১৯৪৭ সালে প্রায় নিঃসহায় ৯ কোটি মুসলমান যদি ভারত কেটে তিন টুকরো করতে পারেন, তবে ২০২০ সালে ২৫ কোটি প্রবল প্রতাপান্বিত মুসলমান, যারা আজও পাকিস্তানকে ক্রিকেট খেলায় জিতলে বাজি পোড়ান, টিভি-তে মালা দেন ব্যাণ্ড পার্টি বের করেন।...তারা কি বসে বসে রামধুন গাইবেন? আর আমরা হিন্দু পাঁঠার দল—নিশ্চিন্তে সেক্যুলারিজম-এর ঢেঁকুর তুলে নানা দল উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ছি। কিন্তু এ ভাবে আর কত দিন...???

মনে রাখা দরকার আমাদের এই পোড়া গণতন্ত্রের দেশে "সংখ্যাই" হল সবচেয়ে বড় সত্য। এখন আর বাইরের দেশ থেকে কামান বন্দুক নিয়ে 'নারায়ে এ তকবির' ধ্বনি দিতে দিতে কেউ ভারত দখল করতে আসবে না। শুধু সংখ্যা বাড়িয়েই হাসতে হাসতে ভারতবর্ষ দখল করা সম্ভব। হয়তো স্লোগান উঠবে— "লড়কে লিয়া পাকিস্তান—হাঁসকে লেঙ্গে হিন্দুস্তান।"

হিন্দু বন্ধুরা,—ধর্মনিরপেক্ষতা ছেড়ে তাই এবার রাজনীতি নিরপেক্ষ হতে শেখো। হিন্দুর হিন্দুত্ব ছাড়া আর অন্য কোন দল হতে পারে না। এই সত্যকে মানতে শেখ—একমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল ও সংবেদনশীল হিন্দুত্বই তোমাকে বাঁচাতে পারে। আর তুমি বাঁচলে—তবেই বাঁচবে তোমার দেশ—তোমার ধর্ম।

আত্মরক্ষা না হলে ধর্মরক্ষা সম্ভব নয়। আর তাই তোমায় আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হতে হবে...জ্ঞান গরিমায় তুমি মহিমান্বিত হলেও তুমি আজও সম্পূর্ণ আত্মরক্ষার কৌশল আয়ত্ত করতে পারো নি। এমনকি বিপদে পড়লে তোমার জ্ঞানগর্ভ মাথায় দৌড়ে পালানোর মত বুদ্ধিটুকুও আসে না। তাই তোমার ঘরে টিভি ফ্রিজ....গাড়ি সব রয়েছে। শুধু নেই গরু তাড়ানোর মতো আপাত নিরীহ একটা লাঠি। আর তাই নিশ্চিত হও অদূর ভবিষ্যতে বিজাতীয় আরব সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব করার জন্যে। তৈরি থেকো পুনরায় আরেকটি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অশনি সংকেতের অপেক্ষায়...।

সাবধান...ভাই...সাবধান...আমি সেই মহাগর্জন...সেই রণনাদ...ভীমহুংকার শুনতে পাচ্ছি...তোমরা কি পাচ্ছো না?

আর তাই আবার শরণাপন্ন হতে ইচ্ছে করছে...পশ্চিমী শক্তির কাছে...।। নতজানু হয়ে সকাতর অনুরোধ জানাতে ইচ্ছে করছে...।

"দাস খৎ যদি ভাগ্যলিখন; তবে তোমাকেই অগ্রাধিকার...। ইংরেজ তুমি ফিরে এসো, দাসত্বে আমার জন্মগত অধিকার...।"

স.স.-২

কবিতার পাতা

জন্মভূমি

সুন্দরগোপাল দাস

অনেক কালের ফেলে আসা এক পথ
অনেক কালের স্মৃতিতে থাকা এক দেশ
আর বিশুদ্ধ এক ডাক-
খোকা, এসেছিস?
আমার হৃদয়ের তন্ত্রীতে আজও বেদনার আবেশ ছরায়।
কখন কক্ষচ্যুত হয়ে ছুটে বেড়িয়েছি অজানা দেশে
যশ, অর্থ খ্যাতির চূড়ায় বসে
মাটির পৃথিবী অনেক ছোট মনে হত
বুড়ির দু'ফোঁটা নোনাজল
ফিরে আসার ডাক -
টলাতে পারেনি আমার কঠিন হৃদয়।
আজ নিশির ডাকের মতো
শৈশব আমায় ডেকে ডেকে ফেরে
সবুজে ঘেরা ছোট্ট বাড়ির মাটি লেপা উঠোনে
আবার হামাগুড়ি দিতে ইচ্ছে করে
তাই সব কিছু ফেলে -
মাটির টানে
মায়ের কাছে ফিরছি আমি
জানি বুড়ি চলে গেছে অনেক কাল। শুধু
আঁচল দিয়ে ঘেরা প্রদীপের সেই ডাক
খোকা এসেছিল? রয়ে গেছে আজও
এই তো মা আমি, তোমার কোলে।

ব্যর্থতা - একটি আধুনিক ত্রিপদী

সমীর গুহরায়

নিশা অতিক্রম কালে দেখা দিলে স্বপ্নজালে
হৃদয় মন্দিরে
অরূপ রতন তনু সব ধন মাগিনু
যোগিনী, তোমারে।
রূপ তব নাই মনে রয়েছ যে দু'নয়নে
কাজলের কালি হয়ে প্রিয়ার
দেখা পেলে তব মুখ দুঃখ মাঝে পাই সুখ
অদর্শনে ফাটে বুক, কাঁদে মোর হিয়া।
নব ফুল নবমালা গাঁথিবে যে তব বালা
পরাইতে গলে তব প্রিয়
নূপুরের কিঙ্কিনী বাজিবে যে রিনিঝিনি
সোনার প্রেমের তরী ভাসাইব সুপ্রিয়।
নিশা কাটি এল সকাল ছিঁড়ি গেল স্বপ্নজাল
গগনে ফুটি ওঠে তরুণ তপন
তবু মোর দু'নয়ন রচি চলে মধুবন
হৃদয়ে হৃদয় লাগি করে অন্বেষণ।
বয়ে যায় রাতদিন বাজে না রবির বীন
প্রতীক্ষায় থাকে মোর শূন্য আঁখি
মুকুল এসে ঝরে যায় বসন্ত কেটে যায়
প্রেম নয় শুধু প্রিয় দিলে যে ফাঁকি।

"সর্বেঃ ভদ্রানি পশ্যন্তুঃ"

নিউ ভারতদর্শন ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস্

চলুন ঘুরে আসি সুন্দরবন

দর্শনীয় স্থানঃ মরিচঝাঁপি, কালির চর, গোসাবা, পাখিরালয়, সজনেখালি, সুধন্যখালি, বনবিধি ভারানি, সুন্দরখালি, পীরখালি, চোরাগাজীখালি, দোবাঁকি দেউলা ভারানি, নেতাধোপানী, নবাঁকি, গাজীখালি, দত্তছেড়া, কুসুমখালি, বাগনা ফরেস্ট, রিভার রায় মঙ্গল, ঝিলা, বুড়ির ডাবরী, সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক,

ভ্রমণ তিথি ঃ (৩দিন ২রাত্রি) ১৪ নভেম্বর সকাল থেকে ১৬ নভেম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত (২০১৪), সহযোগি রাশি ঃ ২৬০০ টাকা

যোগাযোগ ঃ বিকর্ণ নস্কর (৯৮৩০৯০৪০০৬, ৯৫৯৩০৭৮৭২৪, E-mail : bikaran1021@gmail.com

বিঃ দ্রঃ এই টাকার মধ্যেই বোটে থাকা এবং খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। স্পেশাল ডিস্-(চিংড়ি, কাঁকড়া, পার্শে, ভেটকি, খাসী এবং মুরগীর মাংস)

কবিতার পাতা

অঙ্গীকার

কার্ত্তিক দত্ত

এ কি বিভীষিকা ভারত আকাশে
বইছে প্রভঞ্জন
এসো এসো আজি রণসাজে সাজি
শুরু হবে মহারণ।
ভারত ভারতীর দুর্দশা দেখি
ঝরে নয়নের ধারা
অশ্রু নিভাতে বুকের লহুতে
বহিছে অগ্নিধারা।
দৈন্য ঘুচাবো মা তোর আজিকে
আমরা একশো জন
ঘরে ঘরে ডাক দিয়ে ফিরি আজ
জাগো সহস্র মন।
দিনেকের তরে ঘুমাবো না মোরা
না ফিরে যদি মান
লক্ষ কণ্ঠে বল বল সবে
জয় জয় হিন্দুস্থান।
নিজ ভূমে আর পরবাসী হয়ে
সইব না অপমান
জগতের কাছে প্রমাণ করিব
হিন্দু ক্ষাত্র বীর্যবান।
দুর্গম গিরি কেটে মোরা গড়ি
নতুন দিনের পথ
দুঃখ ঘোচাবো ভারত মায়ের
নিয়েছি কঠিন শপথ।
বিজয় তিলক ভাতিবে আবার
আমাদের ললাটে
ইতিহাস লিখি রক্ত লেখায়
নতুন মলাটে।
আকাশে নতুন অংশুর ছটা
তারি গান আজ গাহি
শিবাজী রাজার স্বপ্ন পূরিব
হিন্দু পাদ পাদশাহী।
লক্ষ্য যে এক শতকণ্ঠে
করি তার জয়গান
ভয় নাই ওরে, ভয় নাহি কিছু
সাথে আছে ভগবান।

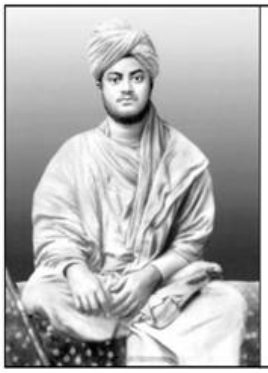

"সন্ন্যাসী ধনী লোকের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখিবে না-তাঁর কাজ গরিবকে নিয়ে। সন্ন্যাসীর কর্তব্য খুব যত্নের সঙ্গে প্রাণপণে গরিবদের সেবা করা এবং এরূপ সেবা করতে পারলে পরমানন্দ অনুভব করা। আমাদের দেশের সকল সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের ভিতর ধনী লোকের তোষামোদ করা এবং তাদের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করার ভাব প্রবেশ করাতে সেগুলি উৎসন্ন যেতে বসেছে। যথার্থ সন্ন্যাসী যিনি, তাঁর কায়মনোবাক্যে এটা ত্যাগ করা উচিত। এভাবে ধনী লোকের পেছনে ঘোরা বেশ্যারই উপযুক্ত, সংসারত্যাগীর পক্ষে নয়।" -**স্বামী বিবেকানন্দ**

প্রসঙ্গ মহাভারত—দুটি প্রশ্ন

সুমন্ত্র মাইতি

মহাভারতের আদিপর্বে মান্ডব্য নামে এক ঋষির বর্ণনা আছে। একদিন তিনি নিজ আশ্রমে মৌনব্রত ধারণ করে তপস্যা করছিলেন এমন সময় কিছু চোর রাজার পেয়াদাদের কাছ থেকে তাড়া খেয়ে ঋষির ঘরে জিনিষপত্র লুকিয়ে রেখে সাথে নিজেরাও লুকিয়ে রইল। পেয়াদারা এসে মুনির কাছে চোরেদের গতিবিধি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করায় মৌনী ঋষির কাছ থেকে কোন উত্তর না পেলেও চোরেদের খুঁজে বের করে এবং সাথে মান্ডব্যকেও সন্দেহবশতঃ তুলে নিয়ে যায়। শাস্তিস্বরূপ সবাইকে শূলেও চড়ায় তারা। মান্ডব্য সেই শূলের ওপরে চড়েই তপ্যসা করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল বাকি সব চোরেরা মারা গেলেও বেঁচে রইলেন শুধু মান্ডব্য। হতভম্ব পেয়াদারা রাজাকে ডেকে আনায় সব খোলসা হল। রাজা হাতজোড় করে নিজ কর্মচারীদের কৃতকর্মের জন্য মাফ চেয়ে ঋষিকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু একটা অসুবিধে থেকেই গেল। শূল থেকে নামানোর সময় তার অগ্রভাগ, যাকে অণী বলা হয়, তা আর বের করা গেল না। সেটা থেকেই গেল মান্ডব্যর শরীরে। অচিরেই তার নাম হল অণীমান্ডব।

কিছুদিনের মধ্যে অণীমান্ডব তপস্যার ফলে স্বর্গে গতিবিধির অনুমোদন পেলেন। একদিন ধর্মরাজের কাছে গিয়ে তিনি অনুযোগের সুরেই বলেন, এত তপস্যা তো করলাম। কিন্তু কোন্ অপরাধে আমাকে শরীরে এই অণী নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে?

উত্তরে ধর্মরাজ বলেন, এই শাস্তিভোগ আসলে বাল্যকালের এক অপরাধের দরুন। কোন এক সময় বালক মান্ডব্য এক ফড়িং-এর পুচ্ছে তৃণের শিষ ঢুকিয়েছিলেন। তারই শাস্তিস্বরূপ তাঁকে এখন শরীরে অণী বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

এতে অণীমান্ডব গেলেন ক্ষেপে। তিনি ধর্মরাজকে পাল্টা দিলেন এই বলে, একজন বালক তার জন্ম থেকে বারো বছর বয়স পর্য্যন্ত যদি কোন অন্যায় কাজও করে, তাহলেও সেটা অন্যায় বলে গণ্য হয় না।

এই বলে তিনি ধর্মরাজকে অভিশাপ দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আইন প্রণয়ন করলেন, জন্ম থেকে চোদ্দ বছর পর্য্যন্ত বালক-কিশোরের দোষ যেন পাপ বলে গণ্য না হয় - আচতুর্দশকাদ বর্ষান্ন ভবিষ্যতি পাতকম্।

অর্থাত জুভেনাইল ক্রাইম বা জুভেনাইল ডিলিংকোয়িন্সি নিয়ে মহাভারতে কিছু তথ্য পাচ্ছি আমরা। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে জানতে ইচ্ছে করে, কিসের ভিত্তিতে জুভেনাইল ক্রাইমের সর্বোচ্চ সীমা আঠারো বৎসর হয়েছে। বালক বা কিশোর কি আঠেরো বৎসর পর্য্যন্ত অপাপবিদ্ধ থাকে?

শিশু মনোবিশেষজ্ঞ কিংবা আইনজীবী, এদের মতামত পেলেও উপকৃত হতাম।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ। বিশাল যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে ক্ষয়ক্ষতির অজস্র চিহ্ন। যুধিষ্ঠির কাতর নেত্রে তাকিয়ে দেখছেন চারদিক। ওই তো শরশয্যায় পিতামহ ভীষ্ম। ওই তো পিতৃবৎ গুরু দ্রোণ, পুত্রবৎ অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, ভ্রাতা কর্ণ, দুর্যোধন। যুদ্ধের উত্তেজনা স্তিমিত, ঘিরে ধরেছে তাঁকে জয়জনিত অবসাদ। চারদিকের হাহাকার এবং কান্নায় ডুকরে উঠে যুধিষ্ঠির বলে উঠলেন, এ কি হল? এ যুদ্ধ তো আমি চাই নি। এই অপরিসীম ক্ষয়, এর হিসেব মেলানো সারা জীবনেও সম্ভব নয়। অথচ এটাও সত্যি যে এই যুদ্ধে আমরা নিমিত্ত মাত্র, সমস্ত দোষ গিয়ে বর্তায় ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের অসূয়া এবং বিদ্বেষের ওপর। ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রেষু তৎ সর্বং প্রতিপৎস্যতে।

এখানে যুধিষ্ঠির খুব সুকৌশলে ধৃতরাষ্ট্রের নাম জুড়ে দিলেন এই বলে যে দুর্যোধনের অহঙ্কার এবং অসূয়া অবশ্যই যুদ্ধের জন্য দায়ী। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহান্ধতাও কিছু কম দায়ী নয়।

পাশাপাশি রাখা যাক কয়েক দিন ধরে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা।

অমরনাথ যাত্রীদের ওপর হামলা। মিডিয়া এবং বিদ্বজনের ভূমিকা? সবার মুখে কুলুপ।

সাহারানপুরের ঘটনা? সবার মুখে কুলুপ।

মীরাটে গণধর্ষণ করে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করা। মিডিয়া চুপ।

অবশ্য শুধুমাত্র ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহান্ধতাকে দায়ী করা অন্যায় হবে। পাশাখেলায় পান্ডবরা হেরে যাওয়ায় যখন রজ:স্বলা দ্রৌপদীকে আনা হয় রাজসভায়, তখন ভীষ্ম, দ্রোণের মত মহামতিরাও তো ছিলেন নিশ্চুপ। তাই যুদ্ধের দায় হয়ত ওনারাও এড়াতে পারেন না।

বিশেষ প্রতিবেদন

এই দ্বিচারিতা আর কতদিন?

দেবতনু ভট্টাচার্য্য

আজকাল প্রতিটি সংবাদপত্রের 'লীড নিউজ' গাজা। ইজরাইলের হামলা সেখানে অব্যহত। প্রতিদিন মারা যাচ্ছে প্রচুর মানুষ। বেশীরভাগই সাধারণ নাগরিক। শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না। কারণ ক্ষেপনাস্ত্র তো আর সন্ত্রাসবাসী আর সাধারণ নাগরিকের ভেদ বোঝে না! আর সে বয়সেরও হিসাব রাখে না। তাই নরমেধ যজ্ঞ চলছে সেখানে নির্বিচারে। বিশ্বজুড়ে ঝড় উঠেছে। বাংলাও বাদ নেই। বাংলার মাটি নরম। তাই বাঙ্গালীর মনও কোমল। গণহারে মানুষ মরলে ব্যথাটা বাকীদের তুলনায় একটু বেশী অনুভূত হয় বাঙ্গালীর মনে। আর বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীরা সাধারণের তুলনায় অনেক বেশী সংবেদনশীল। ফলে গাজার সাধারণ নাগরিকদের মৃত্যুতে তাঁরা শান্ত হয়ে ঘরে বসে থাকবেন তা কি করে হয়? প্রতিবাদে মুখর তারা। অন্যদিকে গাজায় যারা মারা যাচ্ছে তারা সবাই মুসলমান। তাই বাংলার মুসলিম সমাজও রাস্তায় নেমেছে প্রতিবাদ জানাতে। ইজরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসভা, মিছিলে-স্লোগানে মুখরিত সারা বাংলা।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো প্রতিটি সচেতন নাগরিকের কর্তব্য। কিন্তু পাশাপাশি ন্যায়বিচারে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করাটা তার থেকেও বড় কর্তব্য। তাই যে কোন ঘটনায় যখন আমরা প্রতিক্রিয়া দেখাবো তখন ঘটনার প্রেক্ষাপট আড়াল করে আংশিক সত্যের আধারে কোন একটি পক্ষকে অবলম্বন করলে চলবে না। আপনি আমার পেটে কিল মারলেন। আর আমি যখন ঘুরিয়ে আপনাকে চড় মারলাম তখন যদি কেউ আপনার কিল মারাটা না দেখে, শুধুমাত্র আমার চড় মারাটা দেখে, কেবল আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে, সেটা কি ন্যায় বিচার হবে? সেটা তাও মেনে নেওয়া যায়। কারণ সেই ব্যক্তি আমার চড় মারাটা দেখেছেন, আপনার কিল মারাটা দেখেননি। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি দুটোই দেখতেন এবং তার পরেও আমাকে দোষী সাব্যস্ত করতেন, তাহলে কি বলা যায় না যে সেই ব্যক্তি পক্ষপাতদুষ্ট?

আজ যে সমস্ত সভায় ইজরাইলের মুন্ডপাত করা হচ্ছে সেই সভায় কোন একজন বক্তাও কি হামাসের কার্যকলাপের দিকটা তুলে ধরছেন? হামাস আরাফতের ফতেহ গোষ্ঠীকে পরাস্ত করে ২০০৭ সালে প্যালেস্টাইনে ক্ষমতার দখল নেয়। চরম ইজরাইল বিরোধিতাকে মূল ইস্যু করে প্যালেস্টাইনের জনপ্রিয় নেতা ইয়াসের আরাফতের দলকে পরাজিত করে তারা। এই হামাস ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা সহ বহু দেশেই জঙ্গি সংগঠনের আখ্যা পেয়েছে। মিশরের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুড এবং সিরিয়ার আসাদ বিরোধী জঙ্গিগোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ এই হামাস তাদের সন্ত্রাসবাদের শিকড়কে ক্রমশ মজবুত করে তুলেছিল গাজা ভূখন্ডে। সেখান থেকে শুরু হল ইজরাইলের উপর হামলা। তাদের অবিরাম আক্রমণে প্রতি ১৫ সেকেন্ড পরপর বিপদ সংকেত বেজে ওঠে ইজরাইলে। নাগরিকদের সুরক্ষিত স্থানে লুকিয়ে পড়তে হয়। কোন্ দেশ এই অবস্থা নীরবে মেনে নিতে পারে? এর পরেও ইজরাইল গত ৩রা জুলাই হামাসের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। সন্ধির শর্ত, হামাস যদি গোলাগুলি বন্ধ করে তাহলে ইজরাইলের তরফ থেকে কোন আক্রমণ হবে না। যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত এবং সম্মানজনক প্রস্তাব। কিন্তু সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে হামাস। এরপর ১৫ই জুলাই মিশরের তরফ থেকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আসে। মেনে নেয় ইজরাইল। কিন্তু এই প্রস্তাবকেও মেনে নেয়নি হামাস। উল্টে অব্যহত রাখে রকেট হামলা। পরিসংখ্যান বলছে গত ৮ জুলাই থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত হামাস ১৩০০ রকেট এবং মর্টার ছুঁড়েছে ইজরাইলের উপরে। ছুঁড়েছে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পর্যন্ত। গাজা ভূখন্ডে টানেল তৈরী করে সেই চানেলের মাধ্যমে ইজরাইলের ভূখন্ডে ঢুকে হামলা চালিয়েছে এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। এরপর একটি স্বাভিমানী, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সামনে প্রতিআক্রমণ ছাড়া আর কোনও পথ খোলা থাকে কি? রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকারের হাই কমিশনার নভি পিল্লাই পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন, ইজরাইলের সাথে সাথে হামাস ও প্যালেস্টাইনের অন্যান্য সশস্ত্র জঙ্গি গোষ্ঠীর

ইয়াজিদিদের আইএসআইএস দ্বারা নির্বিচারে গণহত্যা

অসহায় ইয়াজিদি পরিবারের শিশুরা

উচিত আন্তর্জাতিক মানবতা আইন ও মানবাধিকার আইন কঠোরভাবে মেনে চলা। কিন্তু হামাসের আক্রমণ বন্ধ হয়নি। ওয়াশিংটন পোস্টের রিপোর্ট বলছে, হাসপাতালকে নিজেদের সামরিক দপ্তর হিসাবে ব্যবহার করছে হামাস। রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিচালিত স্কুল থেকে পাওয়া গেছে প্রচুর সংখ্যায় রকেট। এইভাবেই নাগরিকদের বসবাসের স্থান থেকে ইজরাইলের উপর হামলা চালানো হয়েছে পরিকল্পিতভাবে, যাতে ইজরাইলের পাল্টা হামলায় প্রচুর পরিমাণে সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়। ফলতঃ ইজরাইলের উপর আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি পায়। লাগাতার সন্ত্রাসবাদী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ইজরাইল যে প্রতি আক্রমণের পন্থা অবলম্বন করেছে তা অনুসরণ যোগ্য। এবিষয়ে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জোস আর্নেষ্ট যা বলেছেন তা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। তিনি বলেছেন, কোনও দেশই তার নাগরিকদের উপর রকেট হামলা বরদাস্ত করবে না। এই হিংস্র আক্রমণের প্রতিরোধ করার পূর্ণ অধিকার ইজরাইলের আছে। ইজরাইলের প্রতি আক্রমণে গাজায় সাধারণ মানুষের মৃত্যু অবশ্যই বেদনাদায়ক। তবে এর দায় ইজরাইলের উপর যতটা বর্তায় তার বহুগুণ বেশী বর্তায় হামাসের উপরে। ইজরাইল নিজের ভূখন্ড এবং নিজের নাগরিদের বাঁচাতে যে পন্থা অবলম্বন করেছে তার ঔচিত্য আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের বোধগম্য হওয়া খুবই কঠিন। কারণ আমরা এমন দেশে বাস করি যে দেশের সেনাদের মাথা কেটে নিয়ে যাওয়ার পরেও দেশের নেতারা পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তিবার্তা চালানোতেই বেশী স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা সন্ত্রাসবাদীদের ইন্টারভিউ নিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেন! মুসলিম সন্ত্রাসবাদের এই চরম সত্যকে সাহসের সঙ্গে স্বীকার করার ক্ষমতা আমাদের বুদ্ধিজীবীদের নেই। দেশের মুসলমানরা কেন হামাসের বিরুদ্ধে টু-শব্দটি করছেন না, এই প্রশ্নটা পর্যন্ত করার সৎ সাহস কারো নেই! ইরাকে ISIS যে নারকীয়তা চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে মিছিল বের করার কথা কারো মাথায় আসে না। ISIS ইরাকের অমুসলমান ইয়াজিদি জনগোষ্ঠীর ৫০০ মানুষের উপর নৃশংস অত্যাচার ও গণহত্যা চালালো। 'শয়তানের উপাসক' আখ্যা দিয়ে নির্বিচারে কোতল করা হল তোদের। ইসলামের পবিত্র ধর্মীয় শিক্ষা অনুযায়ী ঘোষণা করা হল, ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের মানুষরা যদি ১০ আগষ্ট সকালের মধ্যে ইসলাম কবুল না করেন, তাহলে তাদের সবাইকে কোতল করা হবে—একটা জাতিকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা এর প্রতিবাদে একটা সভা করার কথা কেন ভাবছেন না? আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটা নিন্দা প্রস্তাবও কোথাও এনেছেন কিনা বলতে পারবো না।

দেশে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। একদিকে হামাস, ISIS-এর সমর্থকরা দেশব্যাপী সন্ত্রাসবাদের নেটওয়ার্ক তৈরী করে চলেছে। অপরদিকে কাপুরুষ, স্বার্থান্ধ, বেতনভোগী পেটোয়া স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীরা বিশ্বমানবতা, প্রগতিশীলতা, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতি গালভরা শব্দের জাল বিস্তার করে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। এই বুদ্ধিজীবীদের ভণ্ডামি যদি আমরা বুঝতে না পারি, তাদের দ্বিচারিতাকে যদি দেখতে না পাই তবে সেদিন আসতে দেরী নেই, যেদিন আমাদের দেশও সম্পূর্ণভাবে জেহাদী সন্ত্রাসবাদের দখলে চলে যাবে। তাই এই ষড়যন্ত্রের জালকে ছিন্ন করতে হবে। চাই সাহস। সত্যকে স্বীকার করার এবং মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করার সাহস।

নিঃশব্দ আতঙ্ক

অম্বিকা গুহরায়

টক্ টক্ টক্ —

ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসেন পলাশবাবু। এত রাতে কে দরজায় কড়া নাড়ছে। পাড়া প্রতিবেশী কারো বিপদ-টিপদ হলো না তো।

কড়া নাড়ার শব্দে অনিতা দেবীর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। স্বামীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তিনি। পলাশবাবু আলো না জ্বালিয়েই বাইরের ঘরে এসে দরজাটা খুললেন।

রাস্তার আলোয় আগন্তুককে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন পলাশবাবু। কেয়া। তাদের মেয়ে কেয়া। কেমন অবিন্যস্ত চেহারা। উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৃষ্টি। এত রাতে, এভাবে, স্থান কাল ভুলে মনটা আবার কঠিন হয়ে উঠল পলাশ বাবুর।

কে গো? ঘরের ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করেন অনিতাদেবী।

নিজেই এসে দেখে যাও—

ততক্ষণে অনিতাদেবী এসে দাঁড়িয়েছেন স্বামীর পিছনে। এমনভাবে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন পলাশবাবু যে সামনের মানুষটাকে দেখাই যায় না। তবু আড়াল থেকে ঘুম চোখে যেন ভূত দেখলেন অনিতা দেবী। কেয়া দাঁড়িয়ে অছে। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের ঘরে আসার জন্য আজ সে অনুমতি প্রার্থনা করছে। পলাশবাবু যেভাবে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে যেন মেয়েকে ঘরে ঢুকতে দিতে চান না।

সরো, আমি দেখছি।

দরজা ছেড়ে বাইরের ঘরের সোফাটায় এসে বসে পড়েন পলাশবাবু।

বছর খানেক আগে এরকমই এক রাতে ফোনটা এসেছিল। কেয়ার ফোন। অফিস থেকে ফিরতেই স্ত্রী এসে বলেছিল কেয়াকে পাওয়া যাচ্ছে না। সুমন বন্ধুদের নিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে। কোলকাতাতেও খবর নেওয়া হয়েছে। কোথাও নেই।

কলেজ থেকে বারোটার মধ্যেই বাড়ি ফেরে কেয়া। তাই দেরি দেখে অনিতা দেবী সুমনকে পাঠিয়েছিল এদিক ওদিক খবর নিতে। মেয়ে অন্তঃপ্রাণ পলাশবাবু অফিসের পোষাকেই বেড়িয়ে পড়েছিলেন। কেয়ার বন্ধুদের বাড়ি গিয়েও কোন খোঁজ পাননি। আসানসোলের মতো এতবড় শহরে কোথায় কোথায় আর খোঁজা যায়। শেষে রাত দশটা নাগাদ থানায় একটা মিসিং ডাইরি করেছিলেন। তারপর এলো এই ফোন।

বাবা, আমি কেয়া—

কোথায় তুই? তোর কোন বিপদ হয়নি তো।

না বাবা! আমি ভালো আছি। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, বাবা, আমি বিয়ে করেছি। দিবাকর ভালো ছেলে। ওরা দাস। তোমরা মানতে পারেবেনা বলেই বিয়েটা এভাবে করতে হল।

কি বলছিস? একি সর্বনাশ করলি তুই। তুই এখন কোথায় আছিস। আমি এক্ষুণি গিয়ে তোকে নিয়ে আসবো। আমি ঠিক আছি বাবা। তুমি চিন্তা কোরো না। কয়েকদিন পর আমি বাড়িতে যাবো—বলে ফোনটা কেটে ছিল কেয়া।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলেন পলাশবাবু। অনিতাদেবী কাঁদতে লাগলেন। সুমনের মুখটা থম্‌থমে। দিদি যে এতবড় ব্লান্ডার করতে পারে, ও বুঝতে পারেনি। নিট্ থেকে কমপিউটার ডিপ্লোমা করেছে, ম্যানেজমেন্ট এর ফাইনাল ইয়ার। টি.সি.এস থেকে কল লেটারও এসে গিয়েছিল। এর মধ্যেই দুম করে বিয়ে করতে হল দিদিকে। নিজের কেরিয়ারটা নিজেই ডোবালো। সুমন জানে বাবা এ বিয়ে কিছুতেই মানবে না। নীচু জাত বলে না। বাবা দিদিকেই বেশি ভালোবাসে। নিজের মতো করে মেয়েকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর আশা, স্বপ্ন সব ধূলিসাৎ করে দিল দিদির একটা ভুল।

না, কেয়া আর এ বাড়িতে আসেনি। তিনদিন পর পলাশবাবু জানতে পারেন কাজিপাড়ার ওসমান শেখকে বিয়ে করেছে কেয়া। কি যেন নাম বলেছিল ছেলেটার? দিবাকর দাস। এতবড় মিথ্যা বললো তাকে কেয়া। বিদ্রোহী হয়ে উঠলো মন। না, এ মেয়ের আর মুখদর্শন তিনি এ জীবনে করবেন না। ভাববেন, তার মেয়ে মারা গেছে। সেই মেয়ে আজ এক বছর পর চোখের সামনে।

আয়, ভেতরে আয়।

ধীরে পদক্ষেপ ঘরে ঢোকে কেয়া। বড় সোফাটার এক কোণে গুটিসুঁটি মেরে দাঁড়াল। এই ঘরেই একদিন সে প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াতো। আজ যেন বসারও অনুমতি দরকার।

রোগা হয়ে গেছে অনেক। অনিতা দেবী ভালো করে দেখেন মেয়েকে। মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে, চোখের তলায় কালি। হাতে গলায় কালসিটের দাগ। মেয়ের উপর রাগ তাঁরও কম নয়। কিন্তু পেটে ধরেছেন যে। উদাসী মেয়েটাকে দেখে মায়ের মন ভেতরে ভেতরে কেঁদে ওঠে।

কিছু খেয়েছিস?

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কেয়া। উত্তর দেয়না।

ফ্রিজে খাবার আছে। গরম করে দিচ্ছি, খেয়ে নে।

—না, আমি কিছু খাবো না।

দেখে তো মনে হচ্ছে সকাল থেকে কুটোটি মুখে পড়েনি। আর ঝামেলা বাড়িয়ো না। কিছু খেয়ে শুয়ে পড়। পলাশবাবু এতক্ষণ গুম্ মেরে বসেছিলেন। সোফা থেকে উঠে বললেন—তোমরা বড় ঘরেই শুয়ে পড়। সকালে উঠে যে চুলোয় যায় যেতে দিও। আমি পাশের ঘরে শুয়ে পড়ছি।

সেই চেনা পরিবেশ, নিজের বিছানায় শুয়েও কেয়া দু-চোখের পাতা এক করতে পারলো না। অনিতাদেবী গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন মেয়ের শরীরটা ফুলে ফুলে উঠছে। কাঁদছে কেয়া। কাঁদুক। ব্যথা-বেদনার অবসান হোক। এক বছর ধরে তারাও তো লুকিয়ে লুকিয়ে কম চোখের জল ফেলেন নি! হাতটা মেয়ের কাঁধের উপরই রেখে দেন অনিতাদেবী।

আজ প্রাণখুলে কাঁদতে ইচ্ছা করছে কেয়ার। মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। কি ভুলটাই না সে করেছিল। নিজেকে নিজেই শেষ করে দিয়েছে। সেদিন ফোনে মিথ্যা কথা বলেছিল বাবাকে। তখনও তার বিয়ে হয়নি। উঠেছিল দিবাকরের এক দূর সম্পর্কের কাকার বাড়িতে। ভেবেছিল বিয়ে হয় গেলে বাবা কি আর তাদের ফেলে দিতে পারবে।

কিন্তু পরদিন দিবাকরের সঙ্গে যখন ওর বাড়ি গেল, সেখানে গিয়ে তো অবাক। এতো মুসলমানের বাড়ি।

জিজ্ঞাসা করেছিল ওকে—তোমার বাড়িতে যাবে না। এটাই তো আমার বাড়ি। এইতো আমার আব্বা, আম্মিজান। আমার ফুফা, চাচা-চাচী। একে একে সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

আকাশে ভেঙে পড়েছিল কেয়ার মাথায়। এই ওর পরিবার! তবে দিবাকর? না, দিবাকর নয়, ওসমান শেখ। এই ওর আসল পরিচয়। কেয়া তো ভালোবেসেছিল, মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল। কিন্তু কেউ ভালোবাসার নামে এতবড় প্রতারণা করতে পারে। পাশা-পাশি ঘুরে বেড়ানোর দিনগুলো মনে পড়তে লাগলো কেয়ার। কোন মন্দির বা থান দেখলে ও প্রণাম করতো। ওগুলো ছিল বুজরুকি, কেয়াকে ভোলানোর জন্য। আজ কেয়া বুঝতে পারছে কতবড়ো মিথ্যার ফাঁদে সে জড়িয়ে পড়েছে। সত্যটা সকলের সামনে ফাঁস করে দেবে বলে চলে আসতে চেয়েছিল কেয়া, কিন্তু ওরা আসতে দেয়নি। দু-মাস বাড়ির বাইরে পা রাখতে দেয়নি কেয়াকে। বাড়িতে কাজি ডেকে জোর করে ইসলাম মতে নিকাহ্ হয় তার। ধীরে ধীরে কেয়া হারিয়ে যেতে থাকে নিজের সত্ত্বা থেকে, সমাজ থেকে।

সত্য জানলে বাবা কিছুতেই মেনে নেবেনা, এটা কেয়া জানতো। তাই ধীরে ধীরে নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে সে। কিন্তু এদের সঙ্গে থাকা যে অসম্ভব। প্রতি মুহূর্তে এরা যে কেয়ার সমাজ নিয়ে ব্যঙ্গ করে। দেব-দেবীর নামে গালি দেয়। ওসমান প্রথম প্রথম প্যার করতো, এখন প্রায় দিনই রাতে বাড়ি ফেরেনা। জিজ্ঞাসা করলে বলে কাজে যায়। কিন্তু কাজটা কী? একদিন চেপে ধরেছিল কেয়া। তাতে বকুনির সঙ্গে মারও খেতে হয়েছিল কেয়াকে। ওই প্রথম, তারপর থেকে ওসমান প্রায়ই মারধোর করতো তাকে। বাড়ির লোকের ব্যবহারও হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। বিয়ের মাস আষ্টেকও যায়নি, কেয়া বুঝতে পারলো সে এই বাড়ির বাঁদি। প্রতি মুহূর্তে সকলের হুকুম তালিম করে যাও। ভুল বা একটু দেরি হলেই জাত তুলে গালাগাল। এমনকি কেয়ার মা-বাবাকেও এরা গালি দিতে ছাড়তো না।

এই সময় গুলোতে বড় কষ্ট হয় কেয়ার কয়েক স্টেশন দূরেই আছে নিজের ঘর, নিজের মানুষ, নিজের সমাজ। অথচ তাদের কাছে যাওয়ার সব পথই যে আজ বন্ধ।

কষ্টটা বুকের মধ্যে ফুলে ফুলে ওঠে। অথচ বলবার মতো একটাও লোক নেই। স্বামী সংসার সবই তো আজ পর। এদের থেকে দূরে কোথাও পালাতে পারলে বেঁচে যায় কেয়া। কিন্তু কোথায় যাবে! অন্ধকূপের মধ্যে পড়ে ছট্‌ফট্ করছে সে। মৃত্যুতেই বুঝি এই যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি। দুপুর বেলাগুলোতে সবাই খেয়ে-দেয়ে ঘুমালে কেয়া একা একা ঘরে শুয়ে কাঁদে। ভালোবাসার এ-কি প্রতিদান পেল সে! ভিন্ন জাত, ভিন্ন সমাজ। কেয়া ভেবেছিল মানিয়ে নেবে। কিন্তু এত ঘৃণা মানুষগুলোর মনে! উঠতে বসতে বিধর্মীর মেয়ে বলে খোঁটা দেওয়া। কখনও তা সহ্যর সীমা ছাড়িয়ে যায়। প্রতিবাদ করে বসে। তখন জোটে চূড়ান্ত অপমান, মার। একবার তো ঘুষি মেরে মুখ ফাটিয়ে দিয়েছিল ওসমান। গল্‌গল করে রক্ত পড়ছিল। তবু কেউ সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়নি। মারটা যেন প্রাপ্য ছিল।

তখন মনে হয়েছিল মরে যাই। আত্মহত্যা করি। নিজেকে একেবারে শেষ করে দিয়ে সব জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাই। এছাড়া অসহায় কেয়া কি বা করতে পারে।

কিন্তু এই অসহায় ভাবটাই কেয়াকে কঠিন করে তুললো। মরবো কেন, আমি বাঁচবো, বাঁচবো! এই অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে আবার মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়াবো। সূর্যের সব রঙ কেমন যেন ধূসর হয়ে গিয়েছে। আবার আকাশে রামধনুর পাখা মেলবে কেয়া। আবার সবাইকে চমকে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠবে। চোয়াল শক্ত হল, হাত মুঠি হল। শুরু হল সুযোগ খোঁজার পালা।

এসেও গেল সুযোগ। বকরি ঈদের দিন। ওসমানের এক

খালার বাড়ি সকলের নিমন্ত্রণ। কেয়াকে আর কোথাও নিয়ে যাওয়া হয় না। বাড়িতে তালা মেরে সবাই গেল ঈদ পালন করতে। অন্য সময় হলে অসাধ্য সাধন করতে পারতো না কেয়া। কিন্তু আজ সে মরিয়া। দোতলার বারান্দা থেকে কাপড় বেঁধে পিছনের নোংরা গলিটায় নেমে পড়লো সে। দুপুর বেলা, নির্জনতা তাই একটু বেশি। আর নোংরা বলে এ পথে লোকের যাতায়াত খুব একটা নেই। তবু সন্তর্পনে গলিটা পেরিয়ে পিছনের রাস্তায় উঠলো। প্রতিবেশিরা কেউ দেখে ফেললে সর্বনাশ। একটু গেলেই কমরাস্তা, কোনমতে একটা গাড়িতে উঠে পড়তে পারলেই হল।

বড় রাস্তায় এসে নাম-নম্বর মা দেখেই একটা বাসে উঠে পড়ে কেয়া। সামান্যই পয়সা আছে। হেল্পার ক্রমাগত চিৎকার করে চলেছে, দক্ষিণপাড়া-হেঁতালপুর-মহেশগঞ্জ। এ বাস তো তাদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছে।

কিন্তু বাড়ি যাবে কোন্ মুখে। বাবা-মা কি তাকে গ্রহণ করতে পারবে? বাবা-মা-সুমনকে খুব কষ্ট দিয়েছে সে। ছোট্ট পরিবারে তারা যেন চারবন্ধু। সুমনকে অঙ্ক করাতে বসলে গল্পই হতো বেশি। তাদের সকলের মুখ পুড়িয়েছে সে।

এসব ভাবতে ভাবতেই হেঁতালপুর এসে গেল, বাস থেকে নেমে পড়লো কেয়া। এখানেই থাকে জয়িতা। কেয়ার বেস্ট ফ্রেন্ড। ওর কাছে গিয়ে সব খুলে বলে ওকে দিয়েই বাড়িতে একটা খবর পাঠাবে। বাড়ি যদি গ্রহণ না করে তবে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে সে। না হলে রেললাইনে মাথা দেবে। কিন্তু ওই নরককুন্ডে আর কিছুতেই ফিরে যাবেনা।

জয়িতা কেয়াকে দেখে অবাক হয়। কিছুটা অখুশিও যেন।

আজকের রাতটা যদি তোর বাড়িতে থাকি?

জয়িতা আমতা আমতা করে বলেছিল, এখানে! নারে। বাড়িতে আত্মীয়রা এসেছে। আর তুই তো জানিস বাবা কেমন কনজারভেটিভ্।

কেয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল—তাহলে—

তুই বাড়ি ফিরে যা না। কাকু-কাকীমাকে সব খুলে বল।

হ্যাঁ, দেখি।

জয়িতা খেতে বলেছিল। কিন্তু কেয়ার খেতে ইচ্ছা হয়নি। বেস্ট ফ্রেন্ড-ও কেমন বদলে গেছে।

আচ্ছা, যদি কিছুক্ষণ তোর এখানে বসি। অন্ধকার নামলেই চলে যাব। ওদের লোক এতক্ষণে নিশ্চয় খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে।

আয় না, আমার পড়ার ঘরে। ওখানে কেউ খুব একটা আসে না। মনে মনে ধন্যবাদ দিয়েছিল জয়িতাকে। বিপদের দিনে এটুকুই বা কে করে! তারপর দীর্ঘ সাড়ে ছয় কিলোমিটার পথ হেঁটে প্রায় মাঝরাতে বাড়ি ফিরেছে কেয়া।

বাবা-মার রাগ করাটা স্বাভাবিক। কিন্তু কি করে তাদের বলবে সে নিজেই ঠকে গেছে। ভালোবাসায় প্রতারিত হয়েছে। ভালোবাসার শিকার হয়েছে। বাবার অভিমানের কথাটা কানে বাজছে কেয়ার, সকালে উঠে যে চুলোয় থাক, যেতে দিও। কি করে বলবে, তার আর কোন চুলোই নেই।

চোখের জলে বালিশটা ভিজে উঠেছে। ক্লান্ত শরীরে একটা আচ্ছন্নভাব। চোখ দুটো বুজে আসতে চাইছে। কল্পনায় কেয়া চলে যায় এক বহু দূরের পৃথিবীতে—বাবার কোল থেকে নেমে এক ছুট—বাবা পিছন পিছন আসছে, আর বলছে দাঁড়া কেয়া, দাঁড়া। কেয়া খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে, আরও জোরে ছুট লাগায়। পিছন ফিরে তাকায় আর বলে—আমায় ধরতে পারে না, আমায় ধরতে পারে না। বেশ কিছুক্ষণ চলে এই খেলা। তারপর পিছন থেকে এসে বাবা ছোট্ট কেয়ার শরীরটাকে কোলে তুলে নেয়।

চোখ খুলে তাকায় কেয়া। বাবা এসে বসেছে মাথার কাছে। মাথায় আস্তে আসতে হাত বুলিয়ে খুঁজছে তার হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে। কেয়া আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবার বুকে। বোবা কান্না এতক্ষণে বাঁধহারা হয়েছে। বাবা, ওরা আমাকে ঠকিয়েছে। খুব কষ্ট দিয়েছে। আমি বাঁচতে চাই বাবা, আমি বাঁচতে চাই।

কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে কেয়ার শরীর। পলাশবাবু কিছু বলেন না। তাঁরও চোখের জল যে আজ বাঁধ মানছে না। মেয়েকে বুকে পাওয়ার স্পর্শ সুখটুকু কথা বলে নষ্ট করতে চাননা তিনি। অনিতা দেবীও বিছানায় উঠে বসেছেন। চোখ তাঁরও ভেজা। আতঙ্কের স্বরে শুধু বললেন, যদি ওরা মেয়েকে নিতে আসে? পারবে না। দৃঢ় ভাবে বলেন পলাশবাবু। মেয়ে আমার অ্যাডাল্ট। ওর নিজস্ব একটা মত আছে।

রাত কেটে ভোর হচ্ছে। পূর্ব দিগন্ত থেকে ছোট্ট একটা আলোর কণা জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। কেয়া ছোট্ট কেয়া হয়ে পলাশবাবুর বুকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। সুমন কাল বাড়ি আসবে। মাসির বাড়ি কোলকাতায় থেকে যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে সে। পলাশবাবু ভাবেন, কোলকাতাতেই কেয়ার একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। ম্যানেজমেন্ট-টা নতুন করে পড়ুক। একটা বছর ভালো করে না পড়ায় কেয়া ফেল করে গিয়েছিল। এবার নিশ্চয়ই ভালোভাবে পাশ করবে। ভাবতে থাকেন পলাশবাবু।

এতক্ষণে ভোরের আলোয় ঘরটা ভরে গিয়েছে।

''অবিশ্বাস্য''

বিকর্ণ নস্কর

রিনি সবেমাত্র বাসে উঠে জানলার ধারে সীটটায় বসেছে, তখনই মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো। রিনি দেখলো অমিত। ফোনটা রিসিভ্ করতেই ওপাস থেকে একটু ঝাঁঝালো স্বরে অমিত বলে উঠলো—কিরে, এখনো পৌঁছাতে পারলি না।!

—বাসে উঠে গেছি। মিনিট কুড়ির মধ্যেই পৌঁছাচ্ছি।

তাড়াতাড়ি আয়, সবাই এসে গেছে।

এই এলাম বলে। ফোনটা কেটে দেয় রিনি।

আজ অমিতের জন্মদিন। এই কলেজে পড়া বুড়ো বয়সে জন্মদিন। অমিত রাজি হয়নি প্রথমে। ওরাই একরকম জোর করে অমিতকে রাজি করিয়েছে। ওরা মানে কাকলি, সোমা, রণজয়, দীপ, রুবী আর রিনি। ওরা প্রত্যেকেই রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে পড়ে।

জন্মদিন মানে আবার কী? নির্ভেজাল আড্ডা আর খাওয়া-দাওয়া। রণজয় বলেছিল, তুই মূল স্পন্সরার, আমরাও কিছুটা শেয়ার করে দেব।

ঠিক হল অমিতের বাড়িতেই বসবে জন্মদিনের আড্ডা। ওর তিনতলার দক্ষিণ দিক খোলা ঘরটা অসাধারণ। এর আগেও ওখানে সবাই মিলে জমিয়ে আড্ডা হয়েছে। আজ আবার রবিবার। রিনি ভাবছে, রবিবাসরীয় সান্ধ্য মজলিস দারুণ জমে যাবে।

এরই মধ্যে বাস শরৎ বোস রোড থেকে গোলপার্কের কাছে এসে পড়লো। রিনি বাস থেকে নেমে দ্রুত পায়ে মিনিট দুয়েকের মধ্যে অমিতের বাড়ি পৌঁছে গেল।

সবাই আগেই এসে গিয়েছিল। রিনি ঢুকতেই সকলেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো। রিনি একটু হুল্লোড়ে, আসর জমাতে ওস্তাদ। হাসি, ঠাট্টা—গল্পে সবাইকে মাতিয়ে দেবে। এসেই রিনি বললো, কিরে কেক-টেক কাটা হয়ে গেছে নাকি? অমিত বললো, কেক নেই। তবে মা ফিস ফিঙ্গার পাঠিয়েছে। বলিস তো তাই কেটে শুভ জন্মদিনের সূচনা করতে পারি। ঠিক সেই সময়ে ঘটলো বিপত্তিটা। দুম করে আলো চলে গেল। এখন সচরাচর লোডশেডিং হয়না। হয়তো কোন ফল্ট হয়ে থাকবে। হঠাৎ আলো যাওয়াতে চারদিকে গাঢ় অন্ধকারে এলাকাটাকে যেন মনে হচ্ছে প্রেতপুরী। অমিত তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে কয়েকটা মোমবাতি এনে জ্বালিয়ে দিল।

রুবী বলে উঠলো, অমিত তোর জন্মদিনটা একেবারে সার্থক হয়ে উঠলো রে! একেবারে ক্যান্ডেল বার্থডে। রুবীর কথায় সকলে হেসে উঠলো। সেই সঙ্গে টপাটপ্ মুখে পুরতে লাগলো মাসিমার ঘরে তৈরী ফিসফিঙ্গার। কাকলি বলে উঠলো পরিবেশটা কেমন একটু রোমান্টিক হয়ে উঠেছে। এরকম পরিবেশে ভূতের গল্প জমে ভালো।

অমিত বললো, কিরে রিনি, তোর স্টকে কিছু আছে নাকি।

কাকলি বলে উঠলো, রিনির স্টকের প্রয়োজন পড়ে না, ইনস্ট্যান্ট বানিয়ে কিছু একটা বলে দেবে।

দীপ ফোড়ন কেটে বলে, হ্যাঁ সে ক্ষমতা রিনির আছে। কিরে রিনি, কিছু একটা ছাড়, ওরকম থম্ মেরে গেলি কেন?

রিনি সবাইয়ের মুখের আলো আঁধারির ছায়ার খেলা দেখে নিয়ে বললো—নারে, গল্প নয়, একদম সত্যি ঘটনা। বিশ্বাস হয়তো করতে পারবিনা, তবু সত্যি।

সোমা বললো, কার ঘটনা?

আমার ছোটবেলায় ঘটে যাওয়া এক অবিশ্বাস্য ঘটনা, যা আমি কাউকে বলতে পারিনা। শুনবি তোরা? প্রত্যেকে চুপ। রিনির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। মোমবাতির কম্পমান শিখায় রিনি ও রিনির ছায়াকে যেন আলাদা সত্তা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে রিনি নয়, ঐ ছায়াই কথা বলছে তাদের সঙ্গে। রিনির মুখটা কেমন থম্থমে, সিরিয়াসও। গভীর ভাবে কি যেন একটা ভাবছে। শুধু অমিত সংক্ষেপে বললো, বল।

রিনি বলতে শুরু করে, তখন আমার বয়স নয় কি দশ। গ্রীষ্মের স্কুলের ছুটিতে মায়ের সঙ্গে গেছি মামারবাড়ি নিশ্চিন্তিপুর। বর্ধমান শহর থেকে কুড়ি মাইল পশ্চিমে একটু আধা গ্রাম নিশ্চিন্তিপুর। তবে এক সময়ে এটা সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। গ্রামের জমিদার রুদ্রনারায়ণ অত্যন্ত দাপুটে ছিলেন। কিন্তু কোন এক কারণে তাদের পরিবার এই স্থান ছেড়ে চলে যায়। তারপর থেকে নিশ্চিন্তিপুরের সেই জৌলুস আর নেই। জমিদার বাড়ি আজ খণ্ডহর। কিন্তু সেই ভাঙা বাড়ি নিয়ে এখানকার লোকেদের মধ্যে অনেক কথা আছে। মাসতোত দাদা-ও জমিদার বাড়ি নিয়ে বলতে গিয়ে চুপ করে গিয়েছিল। শুধু বললে, ভুলেও ঐপথ মাড়াস না। দাদার এই কথাটা আমার মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করলো। ছোটবেলা থেকেই ডানপিটে ছিলাম। মনে মনে ঠিক করেছি একবার তো গিয়ে সেই জমিদারবাড়ি দেখতেই হবে। কেন এখানকার লোকেরা এই বাড়ির নামে ভয়ে সিঁটিয়ে যায়, কেন দাদা ও পথ মাড়াতে বারণ করলো।

কিন্তু সুযোগটা ঠিক মতো পাচ্ছিলাম না। তারপর একদিন সুযোগ এলো। মামা কি একটা বিশেষ কাজে কোলকাতা গেছে, ফিরতে রাত হবে। দাদা গেছে কলেজে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মামী ও মা শুয়ে শুয়ে গল্প করছে। একটু পরেই ঘুমাবে। সেই সুযোগে আমি বেরিয়ে পড়লাম। মিনিট পনেরো হেঁটে আমি উপস্থিত হলাম সেই ভাঙা জমিদার বাড়ির সামনে। জায়গাটা সত্যিই নির্জন। লোকজনের একদমই যাতায়াত নেই এই পথে। জমিদার বাড়ির প্রকান্ড লোহার গেটটার একটা দিক ভেঙে পড়ে আছে, আর একটার অস্তিত্ব নেই। আমি বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। গা যে ছমছম্ করছিল না তা নয়, কিন্তু একটা অদম্য কৌতূহলের বশে আমি এগিয়ে চললাম। বাড়িটার ইট-কাঠ সব ভেঙে গেছে, জানলা গুলোর একটারও পাল্লা নেই, বিশাল বিশাল থামগুলো পলেস্তারা খসে জীর্ণ হয়ে পড়েছে। চারদিকে আগাছা গজিয়ে প্রায় জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। বেশ অনেকটা ভেতরেই ঢুকে পড়েছি। হঠাৎ শুনি ক্যাচ্ ক্যাচ্ কি একটা শব্দ হচ্ছে। কান খাড়া করে শুনলাম। লোহায় লোহায় ঘর্ষণ হয়ে যেমন শব্দ হয়, শব্দটা সেই রকম। পিছন দিকে ফিরে দেখি একটা দোলনায় ছয়-সাত বছরের ফুটফুটে মেয়ে দোল খাচ্ছে। অবাক হয়ে গেলাম। এই পথ দিয়েই তো এলাম। কই, দোলনাটা তখন চোখে পড়েনি। আর এই নির্জন জায়গায় বাচ্চাটা একা একা এল কি করে। যাইহোক, সাহসে ভর করে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলাম। আমাকে দেখে মেয়েটি দোলনা চড়তে বললো। লোভ সামলাতে পারলুম না। দোলনায় ছড়ে বসলুম। মেয়েটির সঙ্গে আলাপ জমে উঠলো। জিজ্ঞাসা করলুম কোথায় থাক। সংক্ষেপে উত্তর দিল মেয়েটি—এখানে।

তোমার বাবা -মা?

তারাও এখানে থাকে। মেয়িটির উত্তর আমাকে অবাক করছে।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম—এই ভাঙা বাড়িতে।

ভাঙা কোথায়?

ভাঙা নয়?

না, কোথায় ভাঙা দেখছ তুমি। আমরা এখানে থাকি। আগেও ছিলাম। চলো, আমার বাড়ি তোমায় ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি। এবার যেন আমি সম্মোহিত। মেয়েটির পেছন পেছন যেতে লাগলাম। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে একটা চওড়া বারান্দায় উপস্থিত হলাম আমরা। মেয়েটি বলতে লাগলো। জান একবার কি হয়েছিল? সেদিন ছিল আমার জন্মদিন। মা নিজে হাতে আমার জন্যে পায়েস রান্না করছিল। পায়েসের গন্ধে আত্মহারা হয়ে ছুটে রান্নাঘরে ঢুকতে যাব, অমনি হোঁচট খেয়ে পড়লাম একেবারে উনুনের উপর। তারপর—উঃ মাগো। বলে মেয়েটি মুখ ঢাকলো ওর দু'হাত দিয়ে। হাত যখন সরালো দেখলাম বীভৎস্য রকমের পোড়া একটা মুখ। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। গা-হাত-পা সব পোড়া। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম। এক দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। পা দুটো যেন কেমন ভারী অবশ হয়ে আসছে। পিছন থেকে একটা তীব্র আর্ত চিৎকার শধু কানে ভেসে আসছে—আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। চিৎকারটা চারদিক থেকে আমার চেতনাকে গ্রাস করে নিতে চাইছে। আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। গেটের কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। তারপর আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান এলো দেখলাম মামার বাড়িতে বিছানায় খাটের উপর শুয়ে আছি। গা-হাত-পায়ে প্রচন্ড ব্যথা, একটু জ্বরও আছে। দাদা কলেজ থেকে ফিরে আমাকে বাড়িতে না দেখে এদিক ওদিক অনেক খোঁজ করে। পরে সন্দেহবশত কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে জমিদার বাড়িতে এসে দেখে গেটের কাছে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছি। জ্ঞান ফিরতেই প্রথম জিজ্ঞাসা করেছিল—আমি কেন ওখানে গিয়েছিলাম। ওখানে ঠিক কি হয়েছিল? কিন্তু কোন প্রশ্নের উত্তরই আমি দিতে পারলাম না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। ততক্ষণে মামা ডাক্তার নিয়ে এসেছেন। বয়স্ক ডাক্তার আমার এ রকম হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মামা তাকে সব খুলে বললেন। শুয়ে ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, কাজটা তোমার ভাগ্নী ভালো করেনি অরুণ। আজ থেকে বেশকিছু বছর আগে জমিদার রুদ্রনারায়ণের মেয়ে জন্মদিনের দিন পুড়ে মারা যায়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে তার মা-ও পুড়ে মরে। আর স্ত্রী কন্যার শোকে রুদ্রনারায়ণ সেই রাত্রেই আত্মহত্যা করেন। তারপর থেকেই ঐ বাড়িতে অদ্ভুত সব কান্ড ঘটতে থাকে। তাই রুদ্রনারায়ণের আত্মীয়রা বাড়ি ছেড়ে পালায়। সেই থেকে বাড়িটা ওরকমভাবেই পড়ে আছে। সব শুনে মা আমাকে আতঙ্কে জড়িয়ে ধরলেন। যাওয়ার আগে ডাক্তারবাবু মাকে বলে গেলেন, আজ আপনার মেয়ে খুব জোর বেঁচে গেছে। কিন্তু জমিদার বাড়িতে আমি কি দেখেছি তা কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারিনি। মা কেও না।

এই বলে রিনি থামলো। অনেকক্ষণ বলার পর ওর একটা দীর্ঘশ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন পড়েছিল। সকলের দিকে তাকিয়ে বললো, কিরে, বিশ্বাস করতে পারবি এই অবিশ্বাস্য ঘটনা।

সকলে নীরবে রিনির মুখের দিকে তাকালো। তাদের মুখের ভাবে ফুটে উঠেছে এক দৃঢ় প্রত্যয়। হ্যাঁ, তারা বিশ্বাস করেছে রিনির কথা। অবিশ্বাস্যর মতো ঠেকলেও রিনির মুখ বলছে এটা ওর জীবনে ঘটে যাওয়া এক চরম সত্যঘটনা। এটা বানানো কোন গল্প হতেই পারেনা।

বিজেপি-তে মুসলিম অনুপ্রবেশ

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কংগ্রেসি সাংবাদিক এম জে আকবর বিজেপিতে যোগদানের সংবাদ ফলাও করে ছাপা হয়েছে। এই এম জে আকবরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জনসাধারণের গোচরে আনার প্রয়োজনে এই পত্রের অবতারণা।

এম জে আকবরের পিতামহের নাম প্রয়াগ। ঊনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে বিহারের এক ভোজপুরী গ্রামে হতদরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সত্তরের দশকের মন্বন্তরে কেউ বাঁচেনি। ওই গ্রামে দৈববশে ১১ বছরের শিশু প্রয়াগ বেঁচে রইল। শিশু প্রয়াগ ট্রেনে চেপে এসে চন্দননগর স্টেশনে নেমে পড়ল। সে চন্দননগরের তেলিনীপাড়া পল্লিতে পৌঁছল। কাছেই ভিক্টোরিয়া পাট কারখানা। ওই গরিব বস্তিতে এক চা-এর দোকানের মালিক ওয়ালি মহম্মদ নামে এক বিহারী নিঃসন্তান দম্পতি তাকে আশ্রয় দিলেন। সে চায়ের দোকানের কাজকর্ম শিখলো। ওয়ালির মৃত্যুর পর চায়ের দোকানে মালিকানা প্রয়াগের ওপর বর্তালো। ওয়ালির স্ত্রী তাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিবাহের ব্যবস্থা করেন। তার নাম রাখা হল রহমতউল্লা। তাঁর পুত্র হলে নাম রাখা হল আকবর আলি। আকবর আলি চন্দননগরের কলেজে শিক্ষালাভ করে ইংরেজি ভাষা রপ্ত করে পাটকলের স্কটসাহেবদের সঙ্গে তার দোস্তি হল, এর মধ্যে এক পুলিশকর্তার দৌত্যে অমৃতসরবাসী মীর হবিবুল্লা নামে এক কাশ্মীরী শাল ব্যবসায়ীর কন্যার সঙ্গে আকবর আলির বিবাহ হল। তাদের এক পুত্রসন্তান জন্মালো। তার নাম রাখা হল মোবাসের জাভেদ আকবর (এম জে আকবর)। তাঁর জন্ম জানুয়ারি ১৯৫১ সালে। তিনি ক্যালকাটা বয়েজ, প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করে সাংবাদিকতায় প্রবেশ করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি মল্লিকা নামে হিন্দু কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। গোধরা কাণ্ডের পর তিনি নরেন্দ্র মোদিকে 'জল্লাদ' বলতেও দ্বিধা করেননি। হঠাৎ রাতারাতি তিনি 'সাম্প্রদায়িক' নরেন্দ্র মোদির সমর্থক হয়ে গেলেন, এটা দেখে আমার খুব একটা ভালো ঠেকছে না। তিনি রাজীব গান্ধির বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কংগ্রেসের টিকিটে মুসলমান প্রধান কিষাণগঞ্জ কেন্দ্রে লোকসভা সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালে জয়ী হতে পারেননি। এখন অনেক নেতাই বিজেপিতে ঢুকবেন বলে লাইন দিয়ে বসে আছেন। তবে বিজেপিকে অতি সাবধানে পা ফেলতে হবে। না হলে এর জন্য চরম মূল্য দিতে হতে পারে।

প্রসঙ্গত দেশভাগের খলনায়ক জিন্নার ঠাকুরদাদাও ইসলাম কবুল করেছিলেন, আর এক খলনায়ক মহম্মদ ইকবাল-এর ঠাকুরদাও ইসলাম কবুল করেছিলেন। তিনি ছিলেন কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ, উপাধি সপ্রু। তিনি গায়ত্রীমন্ত্রকে উর্দুতে অনুবাদ করেছিলেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যেই হিন্দু ইসলাম কবুল করেছেন, তাঁদের তৃতীয় জেনারেশন অর্থাৎ নাতিরা দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এম জে আকবর ইসলাম ত্যাগ করে তাঁর পিতামহের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করে, বিজেপিতে যোগ দিলে আরও গ্রহণযোগ্য হতো।

(রবীন্দ্রনাথ দত্ত, দৈনিক স্টেটসম্যান, ১১ জুন ২০১৪)

"যাহারা বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছে, তাহারাই অদৃষ্টের দোহাই দেয়। যুবকেরা সাধারণতঃ জ্যোতিষের দিকে ঘেষে না। গ্রহবৈগুণ্যের প্রভাবে আমরা হয়ত আছি, কিন্তু তাহাতে আমাদের বেশি কিছু আসে যায় না। বুদ্ধ বলিয়াছেন, 'যাহারা নক্ষত্র গণনা, এরূপ অন্য বিদ্যা বা মিথ্যা চালাকি দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, তাহাদের সর্বদা বর্জন করিবে।' তিনি ইহা জানিতেন, তাঁহার মতো শ্রেষ্ঠ হিন্দু এ পর্যন্ত কেহ জন্মান নাই।" - **স্বামী বিবেকানন্দ**

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি
১৯৪৬-এর দাঙ্গার ভয়াবহতা

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার উপদ্রুত অঞ্চলে সফর করিয়া আসিয়া এক বিবৃতিতে বলেন যে, ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করাই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। যে সহস্র সহস্র নর-নারীকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে, তাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহারা এখনও হিন্দু এবং আমৃত্যু হিন্দু থাকিবেন। তাঁহার কিছুমাত্র প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া হিন্দু সমাজে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারিবেন।

ডঃ মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় উপদ্রুত অঞ্চলের ঘটনাবলির মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট আছে, যাহা ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাসে অভূতপূর্ব। অবশ্য ইহাকে কোনক্রমেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা চলে না। ইহা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্ঘবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত আক্রমণ। এই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিতকরণ এবং লুণ্ঠন, গৃহদাহ এবং সমস্ত বিগ্রহ ও দেবমন্দির অপবিত্রকরণ। কোন শ্রেণীর লোককেই রেহাই দেওয়া হয় নাই। যাহারা অপেক্ষাকৃত ধনী, তাহাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের মাত্রা আরও কঠোর হয়। হত্যাকাণ্ডও পরিকল্পনার অঙ্গ ছিল। কিন্তু যাঁরা অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং যাঁহারা প্রতিরোধ করেন, প্রধানতঃ তাঁহাদের জন্যই এই ব্যবস্থা ছিল। নারীহরণ, ধর্ষণ এবং বলপূর্বক বিবাহও এই সকল কুকার্যের অঙ্গ ছিল। কিন্তু এই প্রকার নারীর সংখ্যা কত, তাহা সহজে স্থির করা সম্ভব নহে। যে সকল ধ্বনি উচ্চারিত হয় এবং সে সকল কার্যপদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায় যে, এ সমস্তই সমূলে হিন্দু-লোপ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার একটি পরিকল্পনার অন্তর্গত ছিল। মুসলিম লীগের জন্য এবং ধর্মান্তরিতকরণ অনুষ্ঠানের ব্যয় ইত্যাদি অন্যান্য কারণে চাঁদা চাওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, আক্রমণকারীগণ ও তাহাদের দলপতিরা মুসলিম লীগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিল। তাহা ছাড়া তাহারা আরও জানিত যে, প্রদেশে তাহাদের নিজেদের গভর্ণমেন্ট রহিয়াছে এবং তাহাদের স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত রাজকর্মচারীরাও সাধারণতঃ তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হইয়া কুকার্যে তাহাদের সাহস আরও বাড়িয়া যায়।

এই সকল কুকীর্তির নায়ক একদল গুণ্ডা ছিল অথবা তাহাদের অধিকাংশই বাহির হইতে আসিয়াছিল—এরূপ বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকরা এইসব পৈশাচিক কাণ্ড করে এবং সাধারণভাবেই এই সকল কার্যের প্রতি লোকের সহানুভূতি ছিল। কয়েক ক্ষেত্রে মুসলমানরা লোকের প্রাণ বাঁচাইতে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

এভাবে যাহাদের জীবন রক্ষা পায়, তাহারা পলায়নে অসমর্থ হইলে তাহাদিগকে ধর্মান্তরিত হইয়া গ্রামে থাকিতে হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে এবং তাহাদের ধনসম্পত্তিও লুণ্ঠন হইতে রক্ষা পায় নাই। ভারী বিপদের আশঙ্কা পূর্বাহ্ণেই কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হইয়াছিল। কিন্তু যাহারা দিনের পর দিন বিদ্বেষ ও হিংসা প্রচার করিতেছিল, সেইসব প্রকাশ্য প্ররোচকদের কার্যকলাপ বন্ধ করিতে তাহারা চেষ্টা করেন নাই। যখন সত্যসত্যই হাঙ্গামা বাধিয়া উঠিল এবং কয়েকদিন যাবৎ চলিতে লাগিল, কর্তৃপক্ষ তখন লোকের ধন-প্রাণ রক্ষা করিতে অপারগ হইলেন। এই অক্ষমতা দ্বারা তাঁরা নিজেরাই নিজেদের নিকট ধিক্কৃত হইয়াছেন এবং স্ব স্ব পদে বহাল থাকা সম্বন্ধে অযোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারা যতক্ষণ উপস্থিত থাকিবেন, ততক্ষণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা সহজ হইবে না। এই প্রকার একটা অঘটন ঘটিয়া যাইবার পরও নোয়াখালিতে মাত্র প্রায় ৫০ জনকে এবং ত্রিপুরায় জনাকতককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সহস্র সহস্র লোক বিপজ্জনক এলাকার অন্তঃস্থল হইতে পলাইয়া গিয়া অত্যাচারীদের নাগালের ঠিক বাহিরে জেলার ভিতরেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। যে সকল স্থান এখনও উপদ্রুত হয় না, সেই সকল স্থান হইতেও অধিবাসীরা হাজারে হাজারে পলাইয়া আসিয়া আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে আশ্রয় লইয়াছে। কুমিল্লা, চাঁদপুর, আগরতলা ইত্যাদি স্থানে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। সর্বশ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ শিশুসহ এই সকল আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিতের সংখ্যা ৫০ হাজার হইতে ৭৫ হাজার হইবে।

এই সকল লোক ছাড়া আরও প্রায় ৫০ হাজার বা ততোধিক লোক এখনও বিপজ্জনক এলাকায় রহিয়াছে। এই এলাকাকে বেওয়ারিশ এলাকা বলা যাইতে পারে। এই এলাকায় অবরুদ্ধ

ব্যক্তিদিগকে একদিনও বিলম্ব না করিয়া উদ্ধার করিতে হইবে। তাহদের সকলকেই ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে এবং তাহারা এখনও অত্যাচারীদের হাতের মুঠার ভিতরে। তাহারা এখন নামেমাত্র মানুষ। তাহাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশই সর্বস্বান্ত এবং তাহাদের শরীর মন দুই-ই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে তপসিলী বা অন্যান্য শ্রেণী-নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর হিন্দু আছে, তাহদের উপর যে অপমান ও নির্যাতন চলিয়াছে, তাহার সীমা নাই। তাহাদের নাম পরিবর্তন করা হইয়াছে, তাহাদের স্ত্রীলোকেরা অপমানিত হইতেছে। তাহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের মুসলমানের মত পোশাক পড়িতে, আহার করিতে ও জীবনযাত্রা যাপন করিতে বাধ্য করা হইতেছে। পরিবারের পুরুষদিগকে মসজিদে যাইতে হয়। মৌলভী বাড়ীতে আসিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেয়। আহার্যের জন্য—এমন কি অস্তিত্ব পর্যন্ত টিকাইয়া রাখিবার জন্য তাহাদিগকে তাহাদের অবরোধকারীদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। তাহারা যাহাতে তাহাদের সমাজ হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে, সেজন্য তাহাদিগকে দ্রুত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। তাহদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেলেই তাহাদের আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ হইবে।

তাহারা প্রতিবাদ করিতে সাহসী হয় না; এমন কি বাহির হইতে যেসব হিন্দু তাহাদের গৃহে আসে, তাহাদের সহিত তাহারা দেখা পর্যন্ত করিতে সাহস করে না—যদি না আগন্তুকদের সহিত সশস্ত্র প্রহরী থাকে। পূর্বে যাহারা নেতৃস্থানীয় হিন্দু ছিল, তাহাদের পুরাতন এবং নূতন উভয়বিধ নাম ব্যবহার করিয়া প্রচারপত্র বিলি করা হইতেছে যে, তাহারা নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং সকলকে ভবিষ্যতেও বর্তমানের মত অবস্থায় থাকিতে অনুরোধ করিতেছে, তাহারা স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মহকুমা হাকিমদের নিকট আবেদন পাঠান হইতেছে। বাহিরে যাইতে হইলে তাহারা স্থানীয় মুসলিম নেতাদের স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র লইয়া বাহিরে যাইতে পারে। আমরা যখন নোয়াখালির নিকট চৌমুহনীতে ছিলাম তখন তাহাদের কয়েকজন তথায় উপস্থিত হইতে সমর্থ হয়। দুইজন মুসলিম লীগ মন্ত্রী ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের সহিত তথায় আলোচনা করিতেছিলেন। আগন্তুকরা তাঁহাদের সম্মুখেই নিজেদের মর্মবিদারী কাহিনী বর্ণনা করে।

এখন সর্বাপেক্ষা জরুরী সমস্যা হইতেছে যে বহুসংখ্যক লোক এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের (মুসলমান) মুষ্টির ভিতরে রহিয়াছে, তাহাদিগকে উদ্ধার করা। গ্রামগুলি পাহারা দিয়া রাখায় এবং রাস্তাঘাট বন্ধ করিয়া রাখায় এতদিন কাহারও পক্ষে উপদ্রুত এলাকায় প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ছিল। এখন মিলিটারী উপদ্রুত এলাকায় যাতায়াত করিতে থাকায় ঐ এলাকায় যাতায়াত ক্রমশঃ সহজ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কেবল যাতায়াত করিলেই চলিবে না, ঐ সঙ্গে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে প্রত্যেকটি গ্রামে প্রবেশ করিয়া অবরুদ্ধ এলাকায় সহস্র-সহস্র হতবল হিন্দু মনে বিশ্বাস ও নিরাপত্তার ভাব ফিরাইয়া আনায় সাহায্য করিতে হইবে।

আমাদের সহস্র সহস্র ভ্রাতা-ভগিনী এইভাবে নতিস্বীকারে বাধ্য হইয়া হিন্দু সমাজের গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করিতে পারি না। তাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহারা এখনও হিন্দু এবং তাঁহারা আমরণ হিন্দু থাকিবেন। অমি প্রত্যেককেই বলিয়াছি, হিন্দুসমাজে ফিরিয়া আসিতে হইলে তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে—কোন ব্যক্তিই এরূপ কোন কথা তুলিতে পারিবেন না। এই নির্দেশের বহুল প্রচার করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠিতেই পারিবে না।

যখনই কোন মহিলাকে উপদ্রুত অঞ্চল হইতে উদ্ধার করা হইবে, বলপূর্বক তাঁহাকে বিবাহ করা হইলেও তিনি বিনা বাধায় স্বীয় পরিবারে ফিরিয়া যাইবেন। যে সকল কুমারী উদ্ধার হইবে, যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে বিবাহ দিতে হইবে। যদি হিন্দু সমাজও দূরদৃষ্টির সহিত বর্তমান বিপদ উত্তীর্ণ না হইতে পারে, তবে ইহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

(শ্যামাপ্রসাদ ঃ বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ, পৃঃ ১৭০-১৭৪)

ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ

দুঃস্বপ্নের থেকেও ভয়ংকর এই ইতিহাসকে চেপে যাওয়া হয়েছে কার স্বার্থে? গান্ধী ও তাঁর চেলারা তো সেইসময় ওইসব এলাকা ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি একথা বিশ্বকে জানাননি কেন? তিনি সত্যের পূজারী ছিলেন? নাকি অসত্যের সাধক? - সম্পাদক।

ভালবাসার নামে চূড়ান্ত প্রতারণা
বিয়ের প্রায় ২ বছর পরে স্ত্রী জানলো স্বামী হিন্দু নয়, মুসলমান

মানস জানা। বয়স ২৮। পূর্ব রানাঘাট প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। মাসে ১৫ হাজার টাকা বেতন। এই রকম পরিচয় সে প্রেমের ফাঁদে ফেলল ২২ বছরের মেয়েটিকে। মেয়েটি পরিবেশ বিজ্ঞানের স্নাতক। দক্ষিণ বারাসত ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজে এম.এ. পড়ার জন্য ভর্তি হয়েছে সবে। কলেজে যাতায়াতের সময় জয়নগর স্টেশনে দেখা হতো প্রায়ই। ধীরে ধীরে প্রেম। মানস বিয়ের প্রস্তাব দিলে মেয়েটি তাকে বলল অভিভাবকদের সাথে কথা বলতে। ছক কষা ছিল আগে থেকেই। মানস দেখা করলো মেয়েটির বাবার সাথে। মেয়ের বাবাও অশিক্ষিত মানুষ নন, পেশায় একটি প্রাইমার স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি স্বভাবতই মানসের বাবা-মায়ের সাথে দেখা করতে চাইলেন। মানস বলল, তার বাবা-মা অন্য একটি মেয়েকে পছন্দ করে রেখেছেন তার জন্য। তাই তাঁরা এই বিয়েতে মত দেবেন না। সুতরাং দেখা করে লাভ নেই। বরং জ্যাঠার সাথে দেখা করা যেতে পারে। অগত্যা জ্যাঠার বাড়িতে যাওয়া হলো। জ্যাঠার সাথে কথা বলে সন্তুষ্ট হলেন মেয়ের অভিভাবকরা। কিন্তু তারা কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পেলেন না যে এ জ্যাঠা আসল নয়, নকল, সাজানো জ্যাঠা।

এবার ছেলের কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে হয়। মেয়ের বাবা নির্দিষ্ট দিনে মানসের স্কুলে পৌঁছে গেলেন। ইউসুফ মোল্লা, সি.পি.এম.-এর স্থানীয় নেতা, নিজেই সেজে গেলেন স্কুলের হেড মাস্টার! আগে থেকেই সবকিছু ম্যানেজ করে রেখেছিলেন এই মোল্লাসাহেব। মেয়ের বাবা মানসকে নিজের চোখে দেখলেন ক্লাসরুমে ছাত্র পড়াতে। নকল হেডমাস্টার মোল্লাসাহেবও ভূয়সী প্রশংসা করলেন মানসের। সুতরাং সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। শুধু শিক্ষকদের রেজিস্টার দেখা হল না। দেখতে চাইলে ইউসুফ মোল্লা বললেন নিরাপত্তার কারণে সব খাতাপত্র স্কুলের সেক্রেটারির বাড়িতে রাখা আছে। পরে একদিন দেখানো যাবে। এই নাটকটা মেয়ের বাড়ির লোকেরা বুঝতে পারল না। ইউসুফ মোল্লার দাপট এতটাই যে, স্কুলের আসল হেডমাস্টার থেকে শুরু করে অন্য কোন শিক্ষক বা কর্মচারীদের ক্ষমতা ছিল না ইউসুফের কথা অমান্য করে। গোটা স্কুল সেদিন এক নাটকের রঙ্গমঞ্চে রূপান্তরিত হয়েছিল ইউসুফ মোল্লার পরিকল্পনায়।

মেয়ের বাবা আর খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করলেন না। হয়তো ভেবেছিলেন, চাকরিজীবি পাত্র পাওয়া গেছে, সময় নষ্ট করলে পরে পস্তাতে হবে। অতএব শুভস্য শীঘ্রম। ২৭ জুন, ২০১২ তারিখে রেজিস্ট্রি হয়ে গেল। এখানেও সেটিং! মানসের কোন রকম সচিত্র পরিচয়পত্র ছাড়াই রেজিস্ট্রি হয়ে গেল। জানা গেছে ডকুমেন্ট হিসাবে মানস রেশন কার্ড এবং মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট জমা দিয়েছিল, যার কোনটিতেই ছবি থাকে না। ছেলে পক্ষের কোন সাক্ষী উপস্থিত ছিল না রেজিস্ট্রির সময়। কিন্তু তাদের রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে গেল!

পরে আনুষ্ঠানিক বিয়ে হল। এই অনুষ্ঠানেও মানসের কোন আত্মীয়-স্বজন আসে নি। বিয়ের পরে জয়নগরে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে সংসার শুরু করলো স্বামী-স্ত্রী। এরপর এক একে মেয়েটির সোনার অলঙ্কার বন্ধক দিতে শুরু করলো মানস। মাসে ১৫ হাজার টাকা বেতন অথচ বন্ধক দেওয়া গহনা ছাড়ানোর কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না—কোন ভাবেই হিসাব মেলাতে পারছিল না মেয়েটি। এভাবেই সন্দেহের সূত্রপাত। এবার বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপ দেওয়া শুরু করলো মানস। মেয়ের বাবা ৪০ হাজার টাকা দিলেন তার দাবি অনুযায়ী। কিন্তু চাপ বাড়তেই থাকলো। একদিন ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল মেয়েটির। মানসকে চেপে ধরা হলো। মেয়েটির এবং তার পরিবারের এই চাপের সামনে ভেঙে পড়ল মানস জানা। বিয়ের এক বছর আট মাস পরে নিজের আসল পরিচয় যখন সে নিজের মুখে প্রকাশ করলো, মেয়ের মাথায় তখন আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম। মানস বলল যে সে মানস নয়, ওসমান। ওসমান আলি। বাবা আবদুল গনি সেখ। সে হিন্দু নয়, একজন মুসলমান। বাড়িতে তার বিবি আছে, সামশেদ বিবি। সে দুই ছেলে আর

এক মেয়ের বাবা। তাদের বয়সও ১৮-র বেশি! ওসমান পরিচালিত একটি এন.জি.ও.-র কাগজপত্র থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তা তার এই স্বীকারোক্তিতেই সত্য বলে প্রমাণিত করে। সেই জ্যাঠার বাড়ি এবং সেই স্কুলে খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে সবই সাজানো।

এই ঘটনা কোন সাধারণ ঘটনা নয়। এ এক গভীর ষড়যন্ত্র। বিশাল এবং সুসংগঠিত চক্র কাজ করছে এর পিছনে। তা না হলে এতবড় নাটক সাজানো যায় না, উপযুক্ত কাগজ ছাড়া রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করা যায় না। এই চক্র এভাবেই হিন্দু মেয়েদের প্রতারিত করে যৌন শোষণ করে চলেছে। মেয়েটির বাবা পঞ্চায়েতে নালিশ করে কোন বিচার পাননি। মন্দিরবাজার থানায় অভিযোগ করতে গেলে পুলিশ তাঁকে আপসে মীমাংসা করে নিতে পরামর্শ দিয়েছে। এ সমস্ত কিছুই একটি চক্রের উপস্থিতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে বলে সকলের ধারণা। ওসমান এখনও এলাকায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমনকি মেয়েটিকে এবং তার পরিবারের লোকেদের হুমকি দিয়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মেয়েটির একমাত্র দাবি প্রতারকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

উত্তপ্ত জয়নগরের ঢোষা

ফেসবুকে পঞ্চম শ্রেণির এক হিন্দু ছাত্রীর ছবি পোস্ট করে ঢোষা হাইস্কুলের আরবী শিক্ষক শেখ সোহরাব আলী। এর পরিপ্রেক্ষিতে অভিভাবকদের মধ্যে ছড়িয়ে পরে অসন্তোষ। ১৯ আগস্ট তারা স্কুলে এসে ঘটনার প্রতিবাদ জানায়। পরে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের হস্তক্ষেপে আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়। পরের দিন, অর্থাৎ ২০ আগস্ট সকালে ১০টা নাগাদ বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় পাঁচশ মুসলমান জনৈক মুসা করিম মোল্লার নেতৃত্বে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ ঢোষা হাটে জমায়েত হয়। শেখ সোহরাব আলীকে হেনস্থা করার প্রতিবাদে হিন্দু বিরোধী স্লোগান দিতে দিতে তারা হাটে ঢুকে পড়ে এবং হিন্দুদের দোকান ভাঙচুর ও লুটপাট শুরু করে। হিন্দুদের পক্ষ থেকেও প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয়, ফলে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। ইতিমধ্যে জয়নগর থানার ও.সি. বিশ্বজিত ব্যানার্জীর নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ মোট ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। বর্তমানে যে হারে ধর্ষণ এবং অপহরণের ঘটনা ঘটে চলেছে, তাতে মানুষের অবস্থা ঠিক ঘর পোড়া গরুর মত। তাই পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্রীর ছবি ফেসবুকে পোস্ট করায় অভিভাবকরা স্কুলে গিয়ে এর প্রতিবাদ জানান। কিন্তু শুধুমাত্র এই কারণে স্থানীয় মুসলিম দুষ্কৃতিদের এই ভাবে হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ঘটনা স্থানীয় হিন্দুদের মনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। জনৈক অভিভাবকের কথায়, ''তাহলে কি একজন অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে শুধুমাত্র এই কারণেই প্রতিবাদ করা যাবে না, যে সে মুসলমান? তারা অন্যায় করলেও তাদের সমর্থনে দলে দলে মুসলমান এভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করবে? তাহলে তাদের সাথে মিলেমিশে থাকা কিভাবে সম্ভব? প্রসঙ্গত, পুলিশের সূত্র অনুসারে ঢোষা হাটে ৭-৮টি দোকান লুটপাট হয়েছে। কিন্তু স্থানীয় সূত্রে খবর পাওয়া গেছে লুটপাট হওয়া দোকানের সংখ্যা ২৫-এর বেশি। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ছয়জন হিন্দু এবং ছয়জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করলেও মূল অভিযুক্ত করিম মোল্লা এখনও পুলিশের নাগালের বাইরে। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পুলিশ জয়নগর থানায় ১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৫৩এ/৫০৫(২)/৫০৬/৩২৫/৪২৭ ধারায় ধৃতদের বিরুদ্ধে কেস দায়ের করেছে (কেস নং ঃ ৯১০/১৪)।

''সর্বোপরি সাবধান হইতে হইবে, অপর ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের সহিত আপোষ করিতে যাইও না। আমার এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, কাহারও সহিত বিরোধ করিতে হইবে; কিন্তু সুখেই হউক, দুঃখেই হউক, নিজের ভাব সর্বদা ধরিয়া থাকিতে হইবে, দল বাড়াইবার উদ্দেশ্যে তোমার মতগুলি অপরের নানারূপ খেয়ালের অনুযায়ী করিতে যাইও না।'' - স্বামী বিবেকানন্দ

গোপালচন্দ্র মুখার্জ্জী জন্মশতবর্ষে
১৬-ই আগস্ট কলকাতায় হিন্দু সংহতির বিশাল পদযাত্রা

গত ১৬ আগস্ট কলকাতায় ১৯৪৬ এর হিন্দুবীর গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্মরণে হিন্দু সংহতির উদ্যোগে এক বিশাল পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সাত হাজার হিন্দু যুবক এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। কলেজ স্কোয়ার থেকে সুরু করে এই পদযাত্রা রাণী রাসমণি এভিনিউতে গিয়ে শেষ হয়। রাণী রাসমণিতে পদযাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ, দিল্লী থেকে আগত ভগত সিং ক্রান্তি সেনার অধ্যক্ষ তেজিন্দর পাল সিং বাগ্গা এবং স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর পৌত্র শ্রী শান্তনু মুখোপাধ্যায়। এই সভায় বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল পিস্ গ্রুপ-এর সভাপতি বিশিষ্ট বৌদ্ধ নেতা শ্রী করুণালঙ্কার ভিক্ষু। এছাড়া অনুষ্ঠান মঞ্চে ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী অসিতাভ ভৌমিক।

শ্রী বাগ্গা তাঁর বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গের সাথে পাঞ্জাবের তুলনা করে বলেন, ১৯৪৭ সালে এই দুটি প্রদেশ একই পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল। দেশভাগের সীমানা এঁকে দেওয়া হয়েছিল এই দুই রাজ্যের মাটির উপর দিয়ে। ভয়ঙ্কর গণহত্যা, নারী ধর্ষণ, ধর্মান্তরকরণ এবং লুঠপাটের শিকার হতে হয়েছিল এই দুই রাজ্যের হিন্দুদের। সর্বস্বান্ত, উদ্বাস্তু হয়ে নতুন করে জীবন শুরু করে আজ পাঞ্জাব উন্নয়নের নিরিখে প্রথম সারিতে অবস্থান করছে, পক্ষান্তরে এই বাংলা সেইভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। এর কারণ বাংলার নোংরা রাজনীতি। তিনি বলেন আজ এ রাজ্যের পাঠপুস্তকে স্বাধীনতার কনিষ্ঠতম শহীদ ক্ষুদিরাম বসুকে সন্ত্রাসবাদী রূপে দেখানো হচ্ছে। নেতাজী, শ্যামাপ্রসাদের জন্মভূমি বাংলায় এই ঘৃণ্য চক্রান্তকে প্রতিহত করার জন্য তিনি আন্দোলনের ডাক দেন। সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ তাঁর বক্তব্যে স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৯৪৬-এ বাংলার হিন্দুদের রক্ষায় তাঁর ভূমিকার স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, মুসলমানদের সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ভয়াবহ নরসংহারের হাত থেকে বাংলার হিন্দুদের রক্ষায় গোপাল মুখোপাধ্যায় যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, সেই কারণেই আজ কলকাতা ভারতের মধ্যে অবস্থান করছে। সেই সময় নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং বরিশালে কোন গোপাল মুখার্জী ছিলেন না বলে আজ সেই স্থানগুলি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আজ বাংলার পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। গ্রামে গ্রামে হিন্দুর জমি দখল হচ্ছে, হিন্দুর উপর অত্যাচার হচ্ছে। প্রশাসন হিন্দুর সুরক্ষা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। দেশবিভাগের পটভূমি আবার তৈরি হচ্ছে এই রাজ্যে। তাই নিজেদের সুরক্ষার দায়িত্ব হিন্দুদের নিজেদের হাতেই তুলে নিতে হবে, যুবকদের শপথ নিতে হবে— 'আবার দেশবিভাজন রুখতে আমিই হবো গোপাল মুখার্জী'। অর্থাৎ সেই সময় গোপাল মুখার্জী হিন্দুদের রক্ষার্থে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, আজ বাংলার যুবকদের

সেই ভূমিকা পালন করার আহ্বান করেন শ্রী ঘোষ।

গাজার বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ইসরাইলকে পূর্ণ সমর্থন করে তিনি বলেন, হামাসের সন্ত্রাসবাদের হাত থেকে নিজের মাটি এবং নাগরিকদের জীবন রক্ষার সম্পূর্ণ অধিকার ইসরাইলের আছে। ইসরাইলের উপর ইসলামিক আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা করে তিনি বলেন, হামাসের জঙ্গিরা নিজেদের নারী ও শিশুদের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে ইসরাইলের উপর যেভাবে রকেট ও মর্টার নিক্ষেপ করছে, তা অমানবিক। ভারতের হিন্দুরা এবং ইসরাইলের ইহুদিরা এই গভীর সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে জর্জরিত। তাই আমরা একই নৌকার সহযাত্রী।

মুসলমানদের রাজনৈতিক কৌশল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলার মুসলমানেরা সি.পি.এম.-কে ব্যবহার করে চাকরিতে সংরক্ষণ আদায় করে নিয়েছে, পরে তৃণমূলকে ব্যবহার করে ইমাম ভাতা আদায় করেছে। এখন তারা বি.জে.পি-র দিকে হাত বাড়িয়েছে। পশ্চিমবাংলায় দলে দলে বি.জে.পি-তে যোগ দিচ্ছে মুসলমানেরা। তাদের কাছে টানতে রাজ্য বি.জে.পি আরও বেশি করে সেক্যুলার হওয়ার চেষ্টা করছে। ১৯৪৬-এর এই দিনগুলিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর দেশবিভাগ রুখে দেওয়ার লড়াইকে স্মরণ করার পরিবর্তে আজ তারা ফুটবল দিবস পালন করছে। এই তোষণের রাজনীতিকে বাংলার হিন্দুরা বরদাস্ত করবে না।

প্রসঙ্গত, ১৯৮০ সালে ইডেন গার্ডেনে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে কয়েকজন ফুটবলপ্রেমীর মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার স্মরণে ১৬ আগস্ট রাজ্য বি.জে.পি-র পক্ষ থেকে একটি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল।

হিন্দু সংহতির এই মহামিছিলে গাজায় হামাসের উপর ইসরাইলের হামলাকে সমর্থন করায় এর সংবাদ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, কারণ অন্য কোথাও ইসরাইলকে সমর্থন করে এতবড় কর্মসূচি পালিত হয়নি। গোটা বিশ্বের ইহুদিরা ও শান্তিকামী মানুষ এই কর্মসূচির জন্য হিন্দু সংহতিকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

১৬-ই আগস্ট মহামিছিল শেষে ধর্মতলায় সমাবেশ

হিন্দু সংহতি-র পক্ষ থেকে সকলকে জানাই

শুভ বিজয়াদশমী ও দীপাবলির

জাতীয়তাবাদী শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

দুষ্কৃতিদের তাণ্ডবে বন্ধ হল হিন্দুদের অনুষ্ঠান ঃ প্রশাসন নিষ্ক্রিয়

মুসলমান দুষ্কৃতিদের দৌরাত্ম্যে এবং প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় হিন্দুরা কি তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ করতে বাধ্য হবে? নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর সংলগ্ন বেলেমাঠ-এর হিন্দুদের সামনে বোধহয় এটাই এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন।

গত ২০ আগস্ট মনসা পূজা উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল বেলেমাঠের হিন্দুরা। অনুষ্ঠান চলাকালীন কিছু মুসলমান দুষ্কৃতি মদ্যপ অবস্থায় উপস্থিত হয়ে মহিলাদের সাথে অশালীন আচরণ শুরু করলে স্থানীয় হিন্দুদের সাথে তাদের বচসা শুরু হয়। ক্ষিপ্ত হয়ে দুষ্কৃতিরা ইলেকট্রিক কানেকশন কেটে দিয়ে অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। পরেরদিন সকাল ১০টা নাগাদ ওই দুষ্কৃতিরা বাঁশের লাঠি, লোহার রড ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের আক্রমণ করে। এই আক্রমণে গুরুতর আহত বিশ্বনাথ সাঁতরা, চাঁদ ধাড়া এবং পরিমল রায়কে নদীয়া জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে হয়। আহতদের মধ্যে পরিমল রায়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

২২ আগস্ট কৃষ্ণনগর কোতয়ালি থানায় এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি অভিযোগ (এফ আই আর নং ৭১০/১৪) দায়ের করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, অভিযুক্ত সেখ বুড়ো মণ্ডল, বুলু সেখ, ফরিদ মণ্ডল, সঞ্জু সেখ এবং মেহেবুল সেখ এখনও এলাকায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেনি। বরং দুষ্কৃতিরা আহতদের বাড়ি গিয়ে কেস তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। ২৮ আগস্ট জনৈক বারিক মণ্ডলের বিরুদ্ধে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার একটি অভিযোগ (জি ডি ই ঃ ২১৭৭) জানানো হয়েছে।

দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে যুবতীকে ধর্ষণের চেষ্টা কলকাতায়

কলকাতার ট্যাংরা এলাকায় ১৮ বছরের ছাত্রীর বাড়ির দরজা ভেঙে ঢুকে ধর্ষণের চেষ্টা করলো মহঃ আলি এবং সাকির আলি। সাহসী মেয়েটির কাছে বাধা পেয়ে প্রচণ্ড মারধর করা হল তাকে। শেষে মেয়েটির তলপেটে লথি মেরে পালিয়ে গেছে দুষ্কৃতিরা। রক্তাক্ত অবস্থায় এন আর এস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে মেয়েটিকে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে আঘাত গুরুতর। পুলিশ এখনও পর্যন্ত একজনকে আটক করতে পেরেছে বলে জানা গেছে। এলাকাবাসীর বক্তব্য, অভিযুক্তরা সকলেই তৃণমূলের সমর্থক এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের মদতপুষ্ট।

মেয়েটি গত ১৪ জুলাই, সেমবার রাত প্রায় ১০-৩০ নাগাদ প্রাইভেট টিউশন পড়ে বাড়ি ফিরছিল। সেই সময় রাস্তায় মহঃ আলি এবং তার সঙ্গীসাথীরা মদ্যপ অবস্থায় ঘোরাঘুরি করছিল। রাস্তায় একা পেয়ে মেয়েটির হাত ধরে একটি নির্জন স্থানের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দুষ্কৃতিরা। মেয়েটি হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টায় ধাক্কাধাক্কি করলে নেশাগ্রস্ত আলি টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যায়। কোনরকমে বাড়ি ফিরে মেয়েটি তার বাড়ির লোকজনকে ঘটনাটি জানায়। মঙ্গলবার ভোর প্রায় ৪-৩০ নাগাদ মহঃ আলি এবং সাকির আলি মেয়েটির থাকার ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে। মেয়েটি বাধা দেওয়ায় ধস্তাধস্তি চলতে থাকে। ইতিমধ্যে বাড়ির অন্য লোকেরা বেরিয়ে এলে দুষ্কৃতিরা মেয়েটির তলপেটে লাথি মেরে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় এন আর এস হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মেয়েটির চিকিৎসা করতে অসম্মত হয়, কারণ এটি পুলিশ কেস। তখন ঐ অবস্থায় তাকে ট্যাংরা থানায় নিয়ে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়। এর পরে পুলিশ একজনকে আটক করেছে।

এলাকাবাসীর বক্তব্য, প্রত্যেকদিন রাতে ট্যাংরার পুরনো কসাইখানার আশপাশের এলাকা সম্পূর্ণভাবে দুষ্কৃতিদের দখলে চলে যায়। এরা সবাই তৃণমূলের সমর্থক এবং স্থানীয় তৃণমূলের নেতাদের আশ্রিত। রাত ন'টার পরে সম্পূর্ণ এলাকা নরকে পরিণত হয়ে যায়। ঐ সময়ে মদ্যপ ও দুষ্কৃতিদের দৌরাত্ম্যে মহিলাদের বাড়ির বাইরে বের হওয়া অসম্ভব হয়ে যায়।

একের পর এক ধর্ষণ এবং শ্লীলতাহানির ঘটনায় জর্জরিত কলকাতা। ট্যাংরার এই ঘটনা আবার প্রমাণ করল আমাদের রাজ্যের রাজধানী কলকাতা মহিলাদের জন্য মোটেই সুরক্ষিত স্থান নয়।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

এই রাজ্যে আইন এবং আদালতের আর কোন প্রয়োজন নেই শাসক দলের নেতারাই এখন মানুষের বিচার করবে

এই রাজ্যে আইন এবং আদালতের আর কোন প্রয়োজন নেই, শাসক দলের নেতারাই এখন মানুষের বিচার এবং দোষীদের শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আর এই কাজে যাতে কেউ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য পুলিশকে তাদের সহায়তা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্তত উত্তর ২৪ পরগণার সন্দেশখালির ঘটনা তারই ইঙ্গিত বহন করছে। গত ২৫ আগস্ট সকালে সন্দেশখালি থানার সরবেড়িয়া অঞ্চলের খোলাচটি পাড়ায় অনুপ মণ্ডল এবং পরেশ মণ্ডলকে ঘেরাও করে প্রচণ্ড মারধোর করে কিছু দুষ্কৃতি। তাতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় অনুপ। পরেশ এখন স্থানীয় খুলনা হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

স্থানীয় একটি বিতর্কিত বিষয়কে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ঝামেলার জেরে অনুপ ও পরেশ গ্রামবাসীদের গণধোলাইয়ের শিকার হয়েছে বলে প্রচার করা হলেও, স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে কুখ্যাত সাজাহান সেখের বাহিনীই এই ঘটনার সাথে যুক্ত। প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, সন্দেশখালি থানার পুলিশের উপস্থিতিতে সাজাহানের দলবল ওই দুজনকে মারধর করে। এমনকি সরবেড়িয়া-আগারাটি অঞ্চলের উপপ্রধান, টিএমসি নেতা সাজাহান সেখ পুলিশের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে নিজের হাতে সেই লাঠি দিয়ে তাদের মারধর করেছে বলেও অভিযোগ করেছে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক গ্রামবাসী।

পুলিশের উপস্থিতিতে কিভাবে এই ঘটনা ঘটল এবং পুলিশ কেন ছেলেদুটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করলো না, তা নিয়ে একটা রহস্য থেকেই যাচ্ছে। জানা গেছে, মারধরের পরে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে অচৈতন্য অবস্থায় ছেলেদুটিকে প্রথমে সরবেড়িয়া টিএমসি পার্টি অফিসে এবং তারপরে থানায় তাদের বেশ কিছু সময় ফেলে রাখা হয়েছিল। পরে তাদের স্থানীয় খুলনা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা অনুপকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পরেশ এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

জনৈক গ্রামবাসীর কথায়, শাসক দলের নেতারাই যদি এখন পুলিশের উপস্থিতিতে মানুষের বিচার করে শাস্তি দিতে শুরু করে, তাহলে আইন-আদালতের আর প্রয়োজন কি?

এলাকায় খোঁজ নিয়ে ঘটনার অন্য একটি দিক সামনে উঠে এসেছে। জানা গেছে এই অনুপ ও পরেশরা সাজাহান বাহিনীরই সদস্য। জনৈক অময় ভুঁইয়া (গোড়া)র নেতৃত্বে এদের দলটি ধীরে ধীরে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। পরেশ, অনুপসহ এই দলের কয়েকজন হিন্দু সদস্য স্থানীয় হিন্দুদের উপরে সাজাহানের অত্যাচারকে ভালো চোখে দেখছিল না। এই কারণেই তারা সাজাহানের রোষের মুখে পড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়ায় নাবালিকা অপহরণ

হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার রাধানগর পঞ্চায়েতের রামহাটিতলা থেকে গত ১৬ জুলাই নিখোঁজ হয় পূজা বাগ। ১৭ বছরের পূজার অভিভাবকরা খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন যে পাশের গ্রাম দ্বারহাটা নিবাসী শেখ মইদুল পূজাকে অপহরণ করেছে। জাঙ্গিপাড়া থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ এফ.আই.আর. না করে একটি মিসিং ডায়েরী করে (৮০৫/২০১৪)। ইতিমধ্যে মেয়ের অপহরণের শোকে পূজার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ২০ জুলাই তার মৃত্যু হয়। এর পর হিন্দু সংহতির স্থানীয় কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় ২২ জুলাই থানায় আরও একটি অভিযোগ করা হয়। এবার পুলিশ এই অভিযোগকে এফ.আই.আর (১৬২/২০১৪) হিসাবে গণ্য করে। ২৩ জুলাই পূজাকে উদ্ধার করে কোর্টে তোলা হয়। পূজাকে তার বাড়িতে পাঠানো হয়েছে এবং মইদুলকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

তাণ্ডবে বানচাল হয়ে গেল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ৫০-তম প্রতিষ্ঠা দিবসের শোভাযাত্রা

১৭ই আগস্ট, ২০১৪ঃ শুভ জন্মাষ্টমীর পুণ্যতিথিতে বানচাল হয়ে গেল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবসের শোভাযাত্রা। অসহায়ভাবে তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করলেন উত্তর দিনাজপুরের কয়েক হাজার পুণ্যার্থী। খবরে প্রকাশ, এইদিন সকালে ঐ জেলার চাকুলিয়া থানার অন্তর্গত শকুন্তলা গ্রাম থেকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রায় দুই হাজার পুণ্যার্থীর একটি সুসজ্জিত শোভাযাত্রা নগর পরিক্রমায় বেরিয়েছিল। এই মিছিলে অনেক মহিলাই তাদের শিশুদের 'শ্রীকৃষ্ণ' সাজিয়ে এক দৃষ্টিনন্দন আবহ তৈরি করেছিলেন।

শোভাযাত্রাটি শকুন্তলা গ্রাম থেকে বার হয়ে চাকুলিয়া থানা অতিক্রম করে বালিগুড়া মোড়ের দুর্গামন্দিরে গিয়ে সমাপ্ত হবার কথা ছিল। সেখানে শোভাযাত্রীদের জন্য খিচুড়ি ভোগের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছিল। অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে মিছিলটি যখন এগিয়ে চলেছে, সেই সময় বেলা ২টা নাগাদ প্রায় ৫০০০ মুসলমান বালিগুড়া মোড়ের সামান্য কিছু পূর্বেই রাজ্য সড়কের উপর একটি নতুন মসজিদের (সাত-আট বছরের) কাছে শোভাযাত্রাটিকে আটকে দেয়। তাদের মুখে ছিল 'আল্লা হু আকবর; নারায়ে ই তকবীর' ধ্বনি। শত অনুরোধেও তারা নারী ও শিশু সহ মিছিলটিকে কিছুতেই দুর্গা মন্দিরের দিকে যেতে দেয়নি। উপরন্তু তাদের সেই রণংদেহী মূর্তি দেখে এবং মুহুর্মুহু আক্রমণাত্মক ধ্বনি শুনে অধিকাংশ মহিলা ও পুরুষ তাদের শিশুদের নিয়ে অভুক্ত অবস্থায় সেই শোভাযাত্রা ছেড়ে চলে যান। বাকিরা ঐ অবস্থাতেই রাস্তার উপর বসে পড়েন। স্বভাবতই দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে আগত অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ঐ মানুষগুলিকে নিতান্ত বাধ্য হয়েই মাত্র ৩০০ মিটার দূরের ঐ দুর্গামন্দির থেকে খিচুড়ি প্রসাদ এনে রাস্তার উপরেই কোনরকমে খাইয়ে দেওয়া হয়। বিকেল ৫টার পরেও মুসলমানেরা তাদের দাবী থেকে একচুলও সরে না আসার দরুণ এবং প্রশাসনের তরফে কোন সাহায্য না পেয়ে শোকস্তব্ধ শোভাযাত্রীরা সমাবেশটি ভেঙে দেন এবং ভগ্নমনোরথে চূড়ান্ত অসহায় বোধে যে যার বাড়ি ফিরে যান। উক্ত দুর্গামন্দিরে যে সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবার কথা ছিল, তা সমূলে পণ্ড হয়।

তারপর স্থানীয় মুসলমানেরা বিডিও অফিস ঘেরাও করে এবং একটি সর্বদলীয় মিটিং ডেকে বিডিও এন সুব্বা-র উপস্থিতিতে একটি প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেওয়া হয় যে অদূর ভবিষ্যতে ঐ রাজ্য সড়কে উক্ত মসজিদটির সামনে দিয়ে পুনরায় কোন নতুন ধর্মীয় শোভাযাত্রা যেতে পারবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চাকুলিয়ার বর্তমান বিধায়ক হলেন ফরোয়ার্ড ব্লকের জনাব আলী ইমরান ওরফে ভিক্টর। স্থানীয় সূত্রের মতে এই বিধায়কের উস্কানিতেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শোভাযাত্রাটিকে পণ্ড করা হল।

সংবাদ সূত্রে প্রকাশ যে রাজ্যের নতুন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের আবহাওয়াতে এলাকার সমস্ত হিন্দু ভোট বিজেপি-র অনুকূলে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় হিন্দু নেতৃত্বের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্যেই সুপরিকল্পিত ভাবে এই কাজটি করা হয়েছে।

"সন্ন্যাস ব্যবস্থায় আমি খুব বেশী বিশ্বাসী নই। ঐ ব্যবস্থার অনেক গুণ আছে। সন্ন্যাসী ও গৃহস্থদের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা উচিত। কিন্তু ভারতে সন্ন্যাস-ভাবেই সমস্ত শক্তি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা সন্ন্যাসীরা শ্রেষ্ঠ শক্তির প্রতীক। সন্ন্যাসী রাজার চেয়ে বড়। ভারতবর্ষে এমন কোন শাসক-নৃপতি নাই, যিনি 'গৈরিকবসন'-ধারীর সম্মুখে বসিয়া থাকিতে সাহস করেন।" -স্বামী বিবেকানন্দ।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

দেগঙ্গায় আক্রান্ত হিন্দুরা ঃ ভাঙচুর ও লুটপাট চলল অবাধে

ফের আক্রমণের মুখে পড়ল দেগঙ্গায় বসবাসকারী হিন্দুরা। ২০১০-এর নারকীয় আক্রমণের স্মৃতি আজও দেগঙ্গাবাসী হিন্দুদের রাত জাগায়। এরই মধ্যে গত ১৭ই আগস্ট রাত প্রায় পৌনে এগারোটা নাগাদ দেগঙ্গার বেড়াচাপা, পালপাড়া এলাকার হিন্দুদের উপর অতর্কিতে হামলা চালায়একদল মুসলমান দুষ্কৃতি। জানা যায় এই দুই গ্রামের হিন্দুদের বেশকিছু ঘরবাড়ি এবং দোকানপাট ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। সেই সঙ্গে চলে বেধড়ক মারধোর। বছর বত্রিশ-এর ব্যবসায়ী দিলীপ পাল ও তাঁর পঁয়ষট্টি বছরে বৃদ্ধা মাও রেহাই পায়নি দুষ্কৃতিদের হাত থেকে । গুরুতর অবস্থায় তাদের স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। কিন্তু কেন এই ঘটনাটি ঘটল? প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তির কথায় সামান্য বচসার জের যে এতদূর গড়াবে এ তারা কল্পনাও করতে পারেনি। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে মুসলমান দুষ্কৃতিরা বেড়াচাপা ও পালপাড়ায় হামলা চালায় বলে কেউ কেউ জানিয়েছেন।এর আগে ২০১০ সালে এরকমই এক ঘটনার সাক্ষী ছিল দেগঙ্গার হিন্দুরা। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ হাজি নুরুল-এর মদতে হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালানো হয় এবং ভেঙে দেওয়া হয় বহু ঘরবাড়ি। বেশ কয়েকটি মন্দিরেও হামলা চালিয়ে ছিল দুষ্কৃতিরা। এবারের ঘটনায় দেগঙ্গা থানায় খবর দেওয়া হলেও পুলিশের পক্ষ থেকে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে স্থানীয় হিন্দুরা এক ঘণ্টার জন্য রাস্তা অবরোধ করেন। পরে এসডিপিও সুধীর চট্টোপাধ্যায় দুষ্কৃতিদের যথাযথ শাস্তি দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়ায় স্বাভাবিক হয় যান চলাচল।

চড়াবিদ্যায় মুসলিম দুষ্কৃতিদের আক্রমণ ঃ গ্রেপ্তার দুই হিন্দু মহিলাসহ ৪ জন

৩০ আগস্ট সকাল ন'টা নাগাদ দঃ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী থানার চড়াবিদ্যা কুমড়োখালি গ্রামে হামলা করলো বিভিন্ন এলাকা থেকে জমায়েত হওয়া হাজার দুয়েক মুসলমান। ব্যাপক বোমাবাজি এবং গুলিগোলা চালিয়ে এই দুষ্কৃতিদের দল গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করলে হিন্দু সংহতির কর্মীদের নেতৃত্বে গ্রামবাসীরা প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। গ্রামে ঢুকতে ব্যর্থ হয়ে দুষ্কৃতিরা গ্রামের বাইরে একটি প্রাচীন বনদেবীর মন্দির ভাঙচুর করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এর পর তিনদিন ধরে দফায় দফায় তারা এই গ্রামের উপর চড়াও হয়েছে বলে জানা গেছে।

পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও দুষ্কৃতিরা আরও ব্যাপক আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। এদিকে পুলিশ বার বার রেইড করায় চড়াবিদ্যা গ্রামের যুবকরা গ্রামছাড়া। ফলে আবার এই ধরণের আক্রমণ হলে হিন্দুদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা আর সম্ভব হবে না বলে গ্রামবাসীরা আশঙ্কা করছেন।

জনৈক গ্রামবাসীর মতে, ''পুলিশ আমাদের নিরাপত্তা দেওয়ার পরিবর্তে আমাদের উপরেই চোটপাট করছে। আমাদের বাড়ির মেয়েদের পর্যন্ত তাদের শিশু-সন্তানসহ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে।'' প্রসঙ্গত, বাসন্তী থানার পুলিশ চড়াবিদ্যা থেকে অসীমা মণ্ডল এবং মালতী প্রামাণিক নামে দুই মহিলাকে তাদের শিশু-সন্তানসহ গ্রেপ্তার করেছে এবং আলিপুর আদালতে তাদের জামিনের আবেদন নাকচ হয়ে গেছে।

পুলিশের আচরণে ক্ষুব্ধ জনৈক ব্যক্তি আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, ''পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের নামে আক্রান্তদেরকেই হেনস্থা করছে। যেভাবে তারা সার্চ লাইট জ্বালিয়ে রাত্রে রেইড করতে আসছে, তাতে মনে হচ্ছে কোন কুখ্যাত উগ্রপন্থীকে ধরতে এসেছে। মুসলিম এলাকায় লোক দেখানো রেইড করার আগে এভাবেই তাদের আগে ভাগে সতর্ক করে দিচ্ছে পুলিশ।''

স্থানীয় লোকেদের ধারণা, এই পরিকল্পিত আক্রমণের পিছনে সড়বেড়িয়ার টিএমসি নেতা সাজাহান সেখ এবং পার্শ্ববর্তী জীবনতলার টিএমসি নেতা সওকত মোল্লার যোগাযোগ আছে। ২ সেপ্টেম্বর সকালে সরবেড়িয়ায় এই দুই নেতার মিটিং হয়েছে বলে এলাকায় খবর ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে চড়াবিদ্যার হিন্দুরা বৃহত্তর আক্রমণের আশঙ্কায় আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাসন্তী থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ১৪ জনের বিরুদ্ধে একটি কেস দায়ের করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এদের বিরুদ্ধে আইপিসি ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩৩২/৩৩৩/৪৮৬/৩৫৩/৫০৪/৫০৬ এবং ২৫/২৭ আর্ম অ্যাক্ট ধারা লাগানো হয়েছে।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

অবৈধভাবে শ্মশানের মাটি কেটে বিক্রি করলো দুষ্কৃতিরা

উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ থানার অন্তর্গত মালিবাড়ির বহু প্রাচীন শ্মশানঘাট থেকে মাটি কেটে বিক্রি করলো কিছু দুষ্কৃতি। মালিবাড়ি অঞ্চলের জনৈক ব্যক্তি হিন্দু সংহতির প্রতিনিধিকে জানিয়েছে এলাকার হিন্দুদের একমাত্র শ্মশানঘাট থেকে মাটি কেটে নিয়ে অন্য জায়গায় বিক্রি করছিল। বিষয়টি এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যকে জানানো হয়। এরপর গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে যারা মাটি কাটছিল তাদের একটি গাড়িকে (নম্বর-ডব্লু বি ৫৯/এ/১৩৬০) গত ৬ই জুলাই কাটা মাটি সহ আটক করে। গাড়ির সদস্যরা সকলেই সংখ্যালঘু ইসলামধর্মীয় ছিল। আটক গাড়িটি গ্রামবাসীরা ডাটোল পুলিশ ফাঁড়ির কর্তব্যরত দারোগাবাবু শ্রী শ্যামল রায়ের কাছে হস্তান্তর করে। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে পুলিশ গাড়িটিকে ছেড়ে দেয়। গ্রামবাসীরা দোষীদের কেন শাস্তি দেওয়া হল না জানতে চাইলে শ্যামলবাবু তার সদুত্তর দিতে পারেননি। পুলিশের ভূমিকায় সন্তুষ্ট হতে না পেরে গ্রামবাসীরা বি.এল.আর.ও. অফিসে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে (৭/৭/১৪)। বি.এল.আর.ও. অফিস থেকে গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করা হয় যে এই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করবেন।

সোনারপুর থানার মল্লিকপুরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ঃ নামল র‍্যাফ

২রা সেপ্টেম্বর রাত ৯টা নাগাদ মল্লিকপুর রেলস্টেশন চত্বর এলাকায় একটি ইভটিজিংয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে র‍্যাফ নামানো হয়। সোনারপুর থানার পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

স্টেশন চত্বরের জনৈক দোকান মালিকের কথায়, ''মল্লিকপুর স্টেশন চত্বরে মুসলমান ছেলেদের আড্ডা। মহিলাদের দিকে কটূক্তি ছুঁড়ে দেওয়া বা অশালীন ইঙ্গিত করা এদের প্রতিদিনের কাজ। ঝামেলার ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করে না।''

ওই দিন স্থানীয় হিন্দু ছেলেরা প্রতিবাদ করায় তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। মুসলিম ছেলেদের দিক থেকে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনামূলক মন্তব্য ভেসে আসতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, ''হিন্দুদের মাথা কেটে নিয়ে ফুটবল খেলব''—এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে মারামারি শুরু হয়''। খবর পেয়ে সোনারপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে র‍্যাফ নামাতে হয়। এলাকার এখনও উত্তেজনা আছে। পুলিশ ও র‍্যাফ এলাকায় টহল দিচ্ছে।

পেট্রাপোলে প্রায় তেরো কেজি সোনার বিস্কুট উদ্ধার

প্রায় চার কোটি টাকার সোনা উদ্ধার হল পেট্রাপোল সীমান্ত লাগোয়া কলঘর এলাকা থেকে। বিএসএফের গোয়েন্দা শাখার দেওয়া খবরের ভিত্তিতে ৪০ নম্বর ব্যাটেলিয়নের হরিদাসপুর ক্যাম্পের জওয়ানেরা বুধবার সকালে অভিযান চালায়। উদ্ধার হয় ১১৫টি সোনার বিস্কুট, যার ওজন প্রায় তেরো কেজি। ওই বিস্কুটের বাজারদার প্রায় ৪ কোটি টাকা। বিএসএফ সূত্রের খবর, জানুয়ারি মাস থেকে সোনার বিস্কুট পাচারের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে। এ পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া বিস্কুটের মূল্য প্রায় ৯ কোটি টাকা।

বিএসএফ কর্তারা জানিয়েছেন, এদিন সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ খবর আসে, বাংলাদেশ থেকে সোনার বিস্কুট ঢুকবে এ দেশে। সেই মতো জওয়ানেরা প্রস্তুত ছিলেন। প্রায় ১০টা নাগাদ তাঁরা দেখতে পান, স্থানীয় কালিয়ানি ও পিরোজপুর গ্রামের মাঝে কলঘর এলাকা দিয়ে এক যুবক বাইক চালিয়ে আসছে। জওয়ানেরা পিছু নিতেই সে বাইক নিয়ে পাশের খেতে নেমে পড়ে। জওয়ানেরা তাড়া করলে বাইক ফেলে রেখে পাশের একটি খালে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যায়। বাইকের সিটের তলায় বিস্কুটগুলি ছিল। ওই পাচারকারীর সন্ধানে তল্লাসি শুরু করেছে বিএসএফ।

পুলিশের অনুমান, এতদিন যে সব সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে, তা ভিনদেশ থেকে পাচার করে আনা হতো। কিন্তু এ দিন যে বিস্কুটগুলি মিলেছে, তা গরু পাচারের টাকার বিনিময়ে দেওয়া হয়েছিল। গরু পাচারকে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশের পাচারকারীদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা লেনদেন হয়। বড় অঙ্কের নগদ টাকা আনানেওয়ার ধরপাকড়ের আশঙ্কা বেশি থাকে। সে জন্যই ইদানীং টাকার বদলে বিস্কুটের মাধ্যমে কারবার চলছে।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

ভারতে শাখা খুলছে আল-কায়দা ঃ আয়মন আল জাওয়াহিরি

আল-কায়দার ভারতীয় শাখা স্থাপনের কথা ঘোষণা করলেন সংগঠনের বর্তমান প্রধান আয়মন আল জাওয়াহিরি। ৩ সেপ্টেম্বর ৫৫ মিনিটের এক ভিডিও বার্তায় তিনি জানান, ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে 'জিহাদের পতাকা' তুলে ধরতেই এই শাখার সূচনা। একই সঙ্গে আফগানিস্তানের কুখ্যাত তালিবান নেতা মোল্লা ওমরের প্রতি তাঁর আস্থা বজায় থাকবে বলেও জানিয়েছেন জাওয়াহিরি। বিশেষজ্ঞদের মতে, মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট-এর (আইএস) উত্থানে শঙ্কিত হয়েই জাওয়াহিরির এই পদক্ষেপ। প্রসঙ্গত, আই এস এখন সম্পূর্ণরূপে আল কায়দার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এই ঘোষণার কথা প্রকাশ্যে আসার পরে ভারতের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি) দেশের সমস্ত থানাকে সতর্ক করে দিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ গোয়েন্দা বিভাগকে ভিডিওটির সত্যতা যাচাইয়ের পাশাপাশি এর উৎস সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলেছেন।

ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যুর পরে ক্রমেই প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছিল আল-কায়দা। জীবনের শেষ কয়েক বছর মূল সংগঠনের কাজ থেকে দূরে থাকলেও আল-কায়দা ও তাদের ছাতার তলায় থাকা অন্য জঙ্গি সংগঠনগুলির কাছে ওসামার ভূমিকা ও অনুপ্রেরণা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু আলকায়দা বা অন্য জঙ্গি সংগঠনগুলির কাছে ওসামার সহযোগী মিশরের চিকিৎসক নেতা আল জাওয়ারির ছবি তেমন উজ্জ্বল নয়। বেশ কয়েক বছর ধরেই পরবর্তী নেতা হিসেবে জাওয়ারির ভূমিকার প্রবল সমালোচনা হচ্ছিল জঙ্গিমহলে। পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে।

জেহাদের বিষয়ে আল-কায়দার 'নরম-মনোভাব'-এর নিন্দা করে আইএস তাদের থেকে সরে আসে। এর পরে সিরিয়ার পূর্ব ও ইরাকের পশ্চিম দিকের একটি বড় অংশ আইএস-এর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সেখানে ইসলামিক রাষ্ট্র স্থাপনের কথা ঘোষণা করে নিজেদের নেতা আবু বকর আল-বাগদাদিকে খলিফা পদে মনোনীত করে আই এস। শুধু সিরিয়া ও ইরাক নয়, এর মধ্যেই আফগান জঙ্গিদের একাংশও ইসলামিক স্টেটের মতাদর্শের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছে। এই নিয়ে পাক-আফগান সীমান্তের দুর্গম আদিবাসী অঞ্চলে প্রচার চলছে বলে জানা গিয়েছে।

এর পরেই আল জাওয়াহিরির ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসে। ভিডিওয়ে মায়ানমার, বাংলাদেশ, অসম, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ ও কাশ্মীরের মুসলমানদের উপর অবিচার ও শোষণের থেকে মুক্ত করার জন্য 'আল-কায়দা ইন ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট' স্থাপনের কথা জানান জাওয়ারি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর মধ্যে ভারত থেকে বেশ কিছু যুবক আইএস যোগ দিয়ে সিরিয়া ও ইরাকে যুদ্ধ করছে। কয়েকজন প্রাণও হারিয়েছে। অসম, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ ও কাশ্মীরের মতো সাম্প্রদায়িক দিক থেকে উত্তেজনা প্রবণ এলাকার যুবকদের নিজেদের দলে টানতে আল জাওয়াহিরির এই পদক্ষেপ বলে ধারণা করা হচ্ছে। জাওয়াহিরির দাবি, জেহাদের পতাকা তুলে এই অঞ্চলগুলিতে নানা রাষ্ট্রের সীমানা মুছে দিয়ে এক মুসলিম রাষ্ট্র নির্মাণ করবে আল-কায়দার এই নতুন শাখা। মুসলিমরা ভারতের জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ হলেও (প্রায় ১৮ কোটি) তা বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম। তা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে গুরুত্ব হারালেও পাক-আফগান সীমানায় এখনও আল কায়দার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। ফলে বিষয়টিতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। কারণ প্রশাসন খুবই ভালভাবেই জানে যে ওহাবী ইসলামের প্রভাব ও জেহাদের আকর্ষণ ভারতের মুসলমানদের মধ্যে কতটা!

পত্রিকা দপ্তর থেকে

মন্দির ভেঙে মূর্তি পুকুরে ঃ থানায় গিয়ে হেনস্থা হল অভিযোগকারীরা

হাওড়া জেলার বাগনান থানার টিঁয়াতলা শ্মশানকালীর মন্দির ভেঙে দিল দুষ্কৃতিরা। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি তুলে নিয়ে পার্শ্ববর্তী পুকুরে ডুবিয়ে দেওয়া হল। বাগনান থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক উল্টে গ্রামবাসীদের জেলে ঢুকিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে তাড়িয়ে দিল অভিযোগকারীদের। সাবসিট অঞ্চলের গদি পাত্রপাড়ায় ঘটনা, গ্রামবাসীদের উদ্যোগে টিঁয়াতলার শ্মশান সংস্কার করে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় বছর পাঁচেক আগে। নিত্যপূজার পাশাপাশি প্রতি সোমবার বিশেষ পূজা নিয়মিতভাবে চলছিল সেখানে। গ্রামবাসীদের এই উদ্যোগে সাবসিট অঞ্চলের পঞ্চায়েত প্রধান কণিকা মণ্ডল বার বার আপত্তি করেছিলেন, এমন কি মন্দির ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছিলেন বলে এলাকার লোকেদের অভিযোগ।গত ২৫ জুলাই রাত্রে দুষ্কৃতিরা এই মন্দির ভেঙে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি পাশের পুকুরে ডুবিয়ে দেয়। ঘটনার প্রতিবাদে পরেরদিন সকালে শ্মশান সংলগ্ন রাস্তা অবরোধ করে স্থানীয় হিন্দুরা। অভিযোগ, সাবসিট অঞ্চলের তৃণমূলের সভাপতি মণি শেখের নেতৃত্বে দুষ্কৃতিদের একটি দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা করে অবরোধকারীদের হটিয়ে দেয়। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন বাগনান থানায় অভিযোগ করতে এলে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক তাদের পাল্টা হুমকি দিয়ে বলে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে কেস দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। জনৈক গ্রামবাসীর কথায়, তৃণমূল জমানায় কি তাহলে মন্দির ভেঙেও দুষ্কৃতিরা পাড় পেয়ে যাবে?

প্রসঙ্গত, গত বছর শ্মশানকালী পুজোর শোভাযাত্রা বের হলে স্থানীয় মুসলমানদের বাধায় তা বন্ধ করতে বাধ্য হয় গ্রামবাসীরা। প্রশ্ন উঠছে, আরাবুল এসে হুমকি দিলে পুলিশ থানা ছেড়ে পালিয়ে যাবে আর সাধারণ হিন্দুরা অভিযোগ জানাতে গেলে পাল্টা কেস দেওয়ার হুমকি দিয়ে তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে—তৃণমূল জমানায় এটাই কি হিন্দুদের প্রাপ্য ন্যায়বিচার?

বর্ধমানে নাবালিকাকে ধর্ষণ ঃ গ্রেপ্তার ৪

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ি থেকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হল নাবালিকাকে। এবার বর্ধমানের কাঁকসা থানার প্রয়াগপুরে ঘটল এই নাক্কারজনক ঘটনা। অভিযুক্ত আমির খান, সাহেব আলী মণ্ডল, শেখ কাজল এবং শেখ মালোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গত ১১ জুলাই কাঁকসা থানার প্রয়াগপুরে এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়। কাঁকসা থানায় এবিষয়ে একটি মিসিং ডায়েরি করেন পরিবারের লোকেরা। পরে খোঁজখবর নিয়ে জানা যায় যে মেয়েটিকে ফুঁসলিয়ে রাণীগঞ্জে নিয়ে গেছে সাহেব আলি ও তার সঙ্গীরা। এরপর ১৪ জুলাই কাঁকসা থানায় অভিযুক্তদের সম্পর্কে তথ্য দিয়ে এফ.আই.আর করা হয়। গত ৩রা আগস্ট রাতে নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তদের। মেয়েটিকে রাণীগঞ্জের গির্জাপাড়াস্থিত আমিরের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। ৪ আগস্ট শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত মামলার বিচারের জন্য গঠিত বর্ধমানের বিশেষ আদালতে ধৃতদের পেশ করা হয়। বিচারক বৈদ্যনাথ ভাদুড়ি ধৃতদের বিচার বিভাগীর হেফাজতে পাঠিয়ে ৬ আগস্ট আবার আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

২৩ বছরের যুবতীকে গণধর্ষণ গ্রেপ্তার মাসুদ আলী

মালদা জেলার হরিশচন্দ্রপুর থানার রহমতপুর গ্রামে গণধর্ষণের শিকার হল ২৩ বছরের এক যুবতী। গত ৩ সেপ্টেম্বর রাত ১০টা নাগাদ গানের আসর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে এই মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতীকে ধর্ষণ করে চার যুবক। অভিযোগের ভিত্তিতে হরিশচন্দ্রপুর থানার পুলিশ মাসুদ আলী নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত এই যুবক ধর্ষণের দায় স্বীকার করেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। বাবা এবং মা মারা যাওয়ার পর থেকেই মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন চাঁচোল কলেজের স্নাতক এই যুবতী মামার বাড়িতেই থাকছিল। বাড়ির কাছেই ১৫ দিন ব্যাপী গানের আসর বসে। সেখান থেকেই পরিকল্পনা মাফিক তাকে তুলে নিয়ে যায় ওই চার যুবক। ঘটনাস্থলেই মাসুদ আলীকে ধরে ফেলে স্থানীয় জনতা। গণধোলাই দেওয়ার পর তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাকিদের খোঁজ চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

শিক্ষকের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির নালিশ, সড়ক অবরোধ

গৃহশিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে ৩ সেপ্টেম্বর, বুধবার সকাল ১১টা থেকে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন পড়ুয়া ও বাসিন্দাদের একাংশ। বুধবার দঃ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের নয়াবাজার হাইস্কুলের সামনে তপন-গঙ্গারামপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। খবর পেয়ে পুলিশ যায়। প্রায় আড়াই মাস আগে ওই স্কুলের ইংরেজির এক শিক্ষক মইদুল ইসলামের বিরুদ্ধে বাড়িতে পড়ানোর সময়ে অন্য স্কুলের একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। ছাত্রীর পরিবারের তরফে স্কুলের প্রধানশিক্ষকের কাছে অভিযোগ করা হয়।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, ঘটনার পরে স্কুল কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অভিযুক্ত শিক্ষক প্রায় দু'মাস ছুটিতে ছিলেন। সোমবার থেকে ফের তিনি স্কুলে আসতে শুরু করেন। অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া অবধি তাকে স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে সরব হন বিক্ষোভকারীরা। বিকেলে গঙ্গারামপুরে বিডিও বিশ্বজিৎ সরকার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালন সমিতির প্রতিনিধি এবং ওই ছাত্রীর অভিভাবক ও বিক্ষোভকারীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক ডাকেন। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই বৈঠকে ছাত্রীর অভিভাবক এবং বিক্ষোভকারীদের তরফে কেউ যাননি বলে অভিযোগ।

বিশ্বজিৎবাবু বলেন, ''ছাত্রীর শ্লীলতাহানির বিষয়ে অভিভাবকেরা থানায় অভিযোগ করেননি। কেবল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি জানা দরকার। সব পক্ষের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'' স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোজাম্মেল হক বলেন, ''একাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রী আমার স্কুলের পড়ুয়া নয়। মইদুল ইসলামের কাছে ওই ছাত্রী বাড়িতে টিউসন পড়ত।

৮ জুন ছাত্রীর কাকা স্কুলে এসে মইদুলের বিরুদ্ধে ওই অভিযোগ জানান।'' তিনি জানান, ছাত্রীর পরিবারকে থানায় যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া ছাড়াও শিক্ষককে স্কুলে আসতে বারণ করা হয়েছিল। ছাত্রীটির পরিবারের বক্তব্য, ''পুলিশে অভিযোগ করে বিষয়টি চাউর করতে চাওয়া হয়নি। ওই শিক্ষক সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্যই শুধু বিষয়টি স্কুলে জানানো হয়েছিল।''

কিশোরীকে ধর্ষণের দায়ে যাবজ্জীবন

প্রতিবেশী কিশোরীকে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত কাবিল মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল সিউড়ি আদালত। সিউড়ির বিশেষ আদালতের বিচারক শ্রী মহানন্দ দাস গত ২ সেপ্টেম্বর এই রায় ঘোষণা করার পাশাপাশি দোষীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক বছর কারাদণ্ডের আদেশ দেন। রাজ্য সরকারের তরফেও ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাজাপ্রাপ্ত কাবিল মোল্লার বাড়ি বোলপুর থানার মাহিদাপুরে। গত ৩ ফেব্রুয়ারী কাবিল মোল্লার দোকান থেকে ডিম কিনতে গেলে ওই কিশোরীকে দোকানের ভিতরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়। ১১ ফেব্রুয়ারী থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। প্রথমে বোলপুর আদালতে বিচার চললেও পরে তা সিউড়ির বিশেষ আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়।

গৃহবধূ ধর্ষণে গ্রেফতার সালাম মিস্ত্রি

এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে তাঁর প্রতিবেশী যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ২৭ আগস্ট, বুধবার রাতে হাড়োয়া থানার নারায়ণপুর গ্রামে ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে। বৃহস্পতিবার সকালে ওই গৃহবধূ হাড়োয়া থানায় গিয়ে প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করলে শুক্রবার রাতে অভিযুক্ত যুবক সালাম মিস্ত্রিকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায়, ''ওই গৃহবধূর স্বামী তামিলনাড়ুতে একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করেন। ছুটির দিন তিনি বাড়ি আসেন। গৃহবধূর সঙ্গে তাঁর এক মাসি ওই বাড়িতে থাকতেন। কয়েক দিন আগে ওই মাসি সন্দেশখালিতে তাঁর দেশের বাড়িতে বেড়াতে যান। গৃহবধূ একাই বাড়িতে ছিলেন। সেই সুযোগে প্রতিবেশী যুবক সালাম বুধবার রাতে ওই গৃহবধূর ঘরে ঢুকে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ধর্ষণ করে পালিয়ে যায়।''

পত্রিকা দপ্তর থেকে

এগারোটি বিমান জঙ্গিদের দখলে, ৯/১১-র পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা

ত্রিপোলি বিমানবন্দর থেকে উধাও হল ১১টি বিমান। অবশেষে বিমান চুরির দায় স্বীকার করে ফেসবুক-টুইটারে ফলাও করে পোস্ট করা হল হারানো বিমানের পাশে দাঁড়ানো জঙ্গিদের উল্লাসের ছবি। অস্ত্র হাতে বিমানের ডানার উপর দাঁড়িয়ে রীতিমতো 'পোজ' দিয়েছে তারা। কেউ আবার জয়ের উচ্ছ্বাস চাপতে না পেরে দু'হাত তুলে নাচানাচি করছে। তামাম বিশ্বের সদস্য-সমর্থকদের কাছে নিজেদের এই ছবি প্রকাশ করে 'সাফল্য' জাহির করতেও ভোলেনি 'লিবিয়ার ডন' নামে আল কায়দার শরিক ওই জঙ্গিগোষ্ঠী।

বিমান দখলের এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন আমেরিকা। মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরের আধিকারিকদের আশঙ্কা, লিবিয়া থেকে দখল করা ওই বিমান নিয়ে তেরো বছর আগের ৯/১১-র ধাঁচে হামলার পরিকল্পনা করছে জঙ্গিরা।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ওসামা বিন লাদেনের পরিকল্পনায় ওয়াশিংটন ডিসি-র পেন্টাগন এবং নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে মারণ হামলা চালায় আল কায়দা। দু'বছর আগে এই দিনেই লিবিয়ার বেনগাজিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টোফার স্টিভেনসের বাসভবনে হামলা করে তাঁকে হত্যা করেছিল জঙ্গিরা। গত কয়েক মাস ধরে সিরিয়া ও ইরাকে জঙ্গি নিধনে আমেরিকা তৎপর হওয়ার পর থেকেই বদলা নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে আইএস আইসে (ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া)। সম্প্রতি এক আল কায়দা নেতাকে মারতে দক্ষিণ সোমালিয়ায় বিমান হামলাও চালায় মার্কিন সেনা। দুই মার্কিন সাংবাদিকদের মুণ্ডচ্ছেদ করে তার ভিডিও প্রকাশ করেছে জঙ্গিরা।

৯/১১-র তেরো বছর পূর্তিতে জঙ্গিরা যে নতুন করে অস্ত্রে শান দেবে তা আঁচ করেই দু'সপ্তাহ ধরে লিবিয়ার প্রশাসনকে সতর্কবার্তা দিয়েছিল আমেরিকা। চলতি বছরের আগস্টে ত্রিপোলির আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি দখল করে লিবিয়ার ডন। রাজধানী ত্রিপোলি সার্বিকভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে বলে গত রবিবার ঘোষণা করে লিবিয়া প্রশাসন। জানানো হয়, ডন এবং আইএসআইএস-এর শরিক জঙ্গিগোষ্ঠী আনসার আলশারিয়ার হাতেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে দেশের রাজধানী। সেই বিবৃতিতেই বিমান লোপাটের কথাও জানানো হয়।

মার্কিন প্রশাসনের আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তা জানিয়ে আল জাজিরাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে মরক্কোর সেনা বিশেষজ্ঞ আব্দেরাহামানে মেক্কাউই বলেন, ''জঙ্গিরা যে ফন্দি আঁটছে সেটা পরিষ্কার। তবে গোয়েন্দা সূত্রে যা খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে দখল করা বিমান ইতিমধ্যেই অন্য একটি জঙ্গিগোষ্ঠীকে হস্তান্তর করেছে ডন। তারা কারা, তা বলা যাচ্ছে না। তবে মাস্কড মেন ব্রিগেডের কাছে ওই বিমানগুলি থাকতে পারে। হামলার আশঙ্কা প্রবল আরবের তেলসমৃদ্ধ এলাকাগুলিতে''। আর এক জঙ্গি বিশেষজ্ঞ সেবাস্টিয়ান গোরকার মতে, দু'ভাবে হামলা চালাতে পারে জঙ্গিরা। এক, একেবারে ৯/১১ ধাঁচে যাত্রীবাহী বিমানকে ক্ষেপনাস্ত্রে পরিণত করবে। দুই, ফাঁকা বিমানে জঙ্গিদের নিয়ে এমন কোনও জায়গায় পৌঁছে নাশকতা চালাতে পারে যা তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।''

আমেরিকার তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে বিমান লোপাট নিয়ে কোন মন্তব্য না করা হলেও সূত্রের খবর, বিমানের সন্ধান চালাতে শুরু করেছে প্রতিরক্ষা দফতর। প্রসঙ্গত, গদ্দাফি গদিচ্যুত করার পর থেকেই উত্তপ্ত হয়েছে লিবিয়া। এই পরিস্থিতিতে সিরিয়া বা ইরাকের মতো লিবিয়াও যাতে জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত না হতে পারে সে দিকেও নজর দিচ্ছে আমেরিকা।

গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার আবদুল হাই

এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানার রুইমারি গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার হল জনৈক আবদুল হাই। ধৃত যুবক সিপিএম-এর যুব সংগঠনের বাহাদুরপুর লোকাল কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক বলে জানা গেছে। সূত্রের খবর, ওই গৃহবধূর শ্বশুরবাড়ি রানিতলা থানার নসিপুর গ্রামে। গত ১ সেপ্টেম্বর সকালে শেখেরপাড়া গ্রাম সংলগ্ন বাগভাঙ্গা গ্রামে তাঁর বোনের বাড়িতে এসেছিলেন তিনি। সেখানেই রাতের বেলা আবদুল তাকে ধর্ষণ করে। স্থানীয় লোকজন আবদুলকে ধরে ফেলে এবং গাছে বেঁধে মারধোর করে। ২ তারিখ পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

ইরাকে আই.এস.আই.এস.-এ যোগ দেওয়া ভারতীয় যুবক জেহাদি আরিব মাজিদ সিরিয়া যুদ্ধে মারা গেল

সত্যটা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েই গেল। ইসলামিক স্টেট বা আই.এস. যে জেহাদি আন্দোলনের ডাক দিয়েছে তাতে ভারতীয় মুসলমানরাও সাড়া দিয়েছেন। এটা এতদিন ছিল সোস্যাল মিডিয়ার খবর মাত্র। সম্প্রতি সিরিয়ায় যুদ্ধে এক ভারতীয় যুবকের মৃত্যু প্রমাণ করলো তারাও আই.এস. বা ইসলামিক স্টেট-এর পক্ষে। এই জেহাদি সংগঠনের জন্য তারা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। সম্প্রতি সিরিয়ার বিস্ফোভে মারা গেলেন ইরাকে আই.এস.-এ যোগ দেওয়া ভারতীয় যুবক আরিব মজিদ। মহারাষ্ট্রের কল্যাণ থেকে বাকি তিন ভারতীয়র সঙ্গে আই.এস.-এ যোগ দিতে গিয়েছিলেন আরিব।

মঙ্গলবার (২৬/৮) ইরাক থেকে ভারতের বাড়িতে ফোন করেন আরিবের সঙ্গী অপর ভারতীয় যুবক সাহিম টাঙ্কি। তিনিই আরিবের বাড়িতে খবর দিতে বলেন। নভি মুম্বইয়ের কালসেকর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আরিব। তার বাবা এজাদ মজিদ পেশায় ডাক্তার। আরিবের পরিবারের কেউই তার মৃত্যুর কারণ জানতে পারেননি।

গত ২৬শে জুন আরিব মজিদ, সাহিম টাঙ্কি, ফাহাদ শেখ ও আমন টাণ্ডেন ধর্মীয় যাত্রার উদ্দেশ্যে ইরাকে যান। উদ্দেশ্য ছিল জেহাদি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা। তাদেরই একজন আরিবের মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছেছে।

মসুলে গণহত্যা, ৬৭০ জনকে নির্বিচারে হত্যা করলো আই এস জঙ্গিরা

ইরাকে সুন্নীপন্থী ইসলামিক জোট (আই এস) জঙ্গিদের তাণ্ডব ও গণহত্যা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করলো রাষ্ট্রপুঞ্জ (ইউ এন)। সম্প্রতি ইরাকের মসুল শহরে আই এস অন্তত ৬৭০ জন শিয়াপন্থীকে হত্যা করেছে। সিরিয়ায় আই এস-এর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে ড্রোন বিমানের সাহায্যে জঙ্গিদের উপর নজরদারি চালানোর সিদ্ধান্ত নিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার বিভাগের হাইকমিশনার নভি পিল্লাই বলেছেন, ইরাকের বিভিন্ন অংশে আই এস জঙ্গিরা একের পর এক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। ইরাক-সিরিয়া সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নিজেদের দখলে আনা এলাকায় তারা জাতিভিত্তিক হত্যাকাণ্ড, অপহরণ, যৌন পীড়ন, দাসত্বে বাধ্য করা, মানুষ পাচার এবং ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ধ্বংসের মতো জঘন্য অপরাধ চালাচ্ছে। এ সবই মানবাধিকার বিরোধী অপরাধের মধ্যে পড়ে। নিজেদের সমর্থনে বলতে গিয়ে আই এস-এর অত্যাচার থেকে বেঁচে ফেরা ২০ জন ব্যক্তি এবং ১৬ জন প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান উল্লেখ করে পিল্লাই জানান, গত ১০ই জুন উত্তর ইরাকের মাসুল শহরে বদায়ূশ জেলখানা থেকে ধৃত প্রায় দেড় হাজার বন্দিকে ট্র্যাকে করে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে যায় আই এস জঙ্গিরা। তারপর বন্দীদের মধ্য থেকে যারা সুন্নী মতে বিশ্বাসী তাদের বের করে নিয়ে বাকিদের চারটি সারিতে দাঁড় করিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে। এদের অনেকেই ভিন্ন গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ছিল। ইরাকের কুর্দ যোদ্ধারা অবশ্য মার্কিন বিমান বাহিনীর সাহায্যে আই এস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে। সম্প্রতি আই এস-কে হটিয়ে ইরাকের সবচেয়ে বড় জলাধার মসুল ড্যাম পুনর্দখল করতে পেরেছে। সিরিয়ায় আই এসের কার্যকলাপের কিছু তথ্য আমেরিকার হাতে এসেছে। বিষদে জানার কারণ দেখিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার সবুজ সংকেত পেতেই সিরিয়ার উপর চালকবিহীন ড্রোন বিমানের সাহায্যে নজরদারি শুরু করেছে মার্কিন সরকার।

সম্প্রতি উত্তর ইরাকে ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে একইরকম বর্বরতা দেখিয়েছে আই এস। ইয়াজিদিরা প্রাচীন জরাথুস্ট সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠী। তাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফতোয়া জারি করে আই এস, নতুবা তাদের হত্যা করার হুমকি দেওয়া হয়। ইয়াজিদিরা ধর্মান্তরিত না হলে ঐ অঞ্চলে গণহত্যা চালায় আই এস। ইয়াজিদি মহিলাদের বন্দি করে খোলাবাজারে ক্রীতদাসী করে বিক্রি করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতে এই নারকীয় পৈশাচিক বর্বরতার চিত্র উঠে এসেছে বার বার। অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি আই এস-এর এই অমানবিক আচরণে সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে তারা শঙ্কিতও। কারণ ইসলামিক স্টেটস্-এর দাবি শুধু যে ইরাক-সিরিয়াতে সীমাবদ্ধ থাকবে না, এটা সকলে বুঝতে পারছে। সদ্য উদ্ভূত এই সমস্যা আজ সারা বিশ্বের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমী শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো এই সমস্যার মোকাবিলায় কি পদক্ষেপ নেয়, এখন সেটাই দেখার।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

রাওয়ালপিণ্ডির ঐতিহাসিক মন্দির ভাঙার সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান সরকার

সেনা শহর রাওয়ালপিণ্ডির বহুদিনের পুরানো ঐতিহ্যবাহী একটি মন্দির ভাঙার নোটিশ ঘিরে ক্ষোভ ছড়িয়েছে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুদের মধ্যে। ১৯৩৫ সালে চাকানালার গ্রেসি লাইনস্ এলাকায় মহাঋষি ওয়ালমেক স্বামীজি মন্দির ও তার সংলগ্ন একটি হিন্দু সমাধিক্ষেত্র নির্মাণ করে। সম্প্রতি পাকিস্তান সরকার জানিয়েছে, সেনাবাহিনীর ব্যারাক তৈরির জন্য মন্দির ও তার সংলগ্ন সমাধি ক্ষেত্রটি ভেঙে ফেলা হবে। গত ১২ই আগস্ট এক নোটিশ জারি করে বিষয়টি হিন্দু সম্প্রদায়কে জানানো হয়েছে। প্রাক্-স্বাধীনতা আমলে তৈরি মন্দিরটি বালাকনাশ মন্দির নামেই বেশি পরিচিত। হিন্দু সমাধিক্ষেত্র ছাড়াও তার পাশে ৫৩টি সিঙ্গল রুমের বাড়ি আছে। সেনা ছাউনি করলে তা সবই ভাঙা পড়বে। হিন্দুরা একজোটে স্থানীয় আদালতে এর বিরুদ্ধে পিটিশন দাখিল করে। আপাতত মন্দির, সমাধিক্ষেত্র ভাঙার উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে আদালত। মন্দির ও তার এলাকা সামরিক কর্তৃপক্ষ পরিচালিত রাওয়ালপিণ্ডি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের এক্তিয়ারে পড়ে।

অশোক চাঁদ নামক এক সংখ্যালঘু হিন্দুর বক্তব্য, স্বাধীনতার আগেই আইন মেনে তৈরি হয়েছিল ঐ মন্দির। এখন তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া অনৈতিক। কেননা, রাওয়ালপিণ্ডিরপ সংখ্যালঘু হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার এই একটিমাত্র জায়গা আছে।

জানা গেছে, মন্দির সংলগ্ন বাড়ির বাসিন্দাদের জন্য বিকল্প জায়গার কথা ভাবছে পাকিস্তান সরকার। তবে নতুন মন্দির গড়ে দেওয়া হবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। দেশভাগের আগে হিন্দু জনসংখ্যা বেশ ভালোই ছিল রাওয়ালপিণ্ডিতে। কিন্তু এখন সেখানে বসবাস করে মাত্র ষাটটি পরিবার।

পাক ক্রিকেট দলকে সমর্থন ঃ দেশদ্রোহিতার পরিচয় দিল কাশ্মীরি ছাত্ররা

আবার দেশদ্রোহিতার পরিচয় দিল কাশ্মীরি ছাত্র যুবকেরা। ভারতের মাটিতে বসে পাকিস্তানকে সমর্থন করার ফলে সংঘর্ষের সৃষ্টি হল। ঘটনাটি ঘটেছে চণ্ডীগড়ের স্বামী পরমানন্দ কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেকনোলজি নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হস্টেলে।

ঘটনার সূত্রপাত, মঙ্গলবার (২৬/৮) রাতে হস্টেলের কমনরুমে বসে শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান ম্যাচ দেখছিলেন জনা পনেরো পড়ুয়া। জম্মু-কাশ্মীরের বাসিন্দা আটজন ছাত্র ম্যাচে পাকিস্তানকে সমর্থন করছিল। এই থেকে বচসা শুরু হয়, যা কিছুক্ষণের মধ্যে গড়ায় হাতাহাতিতে। এর পরে ইট ও লাঠি নিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করে ছাত্ররা। হস্টেলে ভাঙচুর চালানো হয়। আহতেদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও আঘাত গুরুতর না হওয়ায়, প্রাথমিক চিকিৎসা করে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। বুধবার ওই কাশ্মীরি ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করে ঘণ্টাখানেকের জন্য চণ্ডীগড় আম্বালা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে লালরু এলাকার ছাত্র-যুবকেরা। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনা তিরিশেক ছাত্রও।

ঘটনার জেরে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে ঐ বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি। ঘটনার তদন্ত জারি আছে বলে পুলিশে তরফ থেকে জানানো হয়েছে। যেখানে জম্মু কাশ্মীর সীমান্তে ক্রমাগত পাক গোলা বর্ষণে ভারত-পাক রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, সেখানে কাশ্মীরি যুবকদের খেলাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানকে সমর্থন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিশিষ্টমহল মনে করছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘর্ষেও এই ছাত্র-যুবকেরা পাকিস্তানের সমর্থক? এমন প্রশ্ন বুদ্ধিজীবি মহলে উঠে এসেছে।

এই ঘটনা মনে করাচ্ছে গত মার্চ মাসে উত্তরপ্রদেশের একটি বেসরকারি কাশ্মীরি ছাত্রদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের অভিযোগের ঘটনা। সেক্ষেত্রে একটি ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচে পাকিস্তানকে সমর্থন করার জন্য মীরাটের স্বামী বিবেকানন্দ সুভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৭ জন কাশ্মীরি ছাত্রকে সাসপেণ্ড করে কর্তৃপক্ষ। পরে তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের অভিযোগও আনা হয়। এক্ষেত্রেও কাশ্মীরি ছাত্ররা দেশদ্রোহিতার কাজ করেছে। তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং কলেজ থেকে সাসপেণ্ড করার দাবিতে সোচ্চার হয়েছে ছাত্র-যুবকেরা।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

অসহায় শশারানির আত্মসমর্পণ বিধর্মীর হাতে

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে লাভ জেহাদের শিকার হচ্ছে বহু হিন্দু মেয়ে। আবেগের বশে তারা প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে ঘর-পরিবার ত্যাগ করছে। তারপর তাদের জীবন হয়ে উঠছে দুর্বিষহ। সোস্যাল মিডিয়ার দৌলতে তা আজ সর্বজনবিদিত। কিন্তু সম্প্রতি বাংলাদেশে লাভ জেহাদের যে ভয়ানক কাণ্ড ঘটেছে, তা পূর্ববর্তী ঘটনাগুলোকেও হার মানায়।

গোপন সূত্রে জানা গেছে যে চট্টগ্রামের মিরসরাই সদর ইউনিয়নের পূর্ব কিসমত জাফরাবাদ গ্রামের হিন্দু মেয়ে শশারানির নাথকে জোর করে বিয়ে এবং পরে ধর্মান্তরিত করেছে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা। কিন্তু এই অপকর্মটিকে চাপা দিতে বাংলাদেশের দালাল মিডিয়া খবরের মিথ্যা প্রচার করেছে। তারা লিখেছে, ভালোবেসে নিজ ধর্মত্যাগ করে বিরল ভালোবাসা দেখালেন সাবিহা রহমান।

কিন্তু এই বিরল ভালোবাসাটি কি রকম? শশারানির পরিবার জানাচ্ছে, তাদের মেয়ের কলেজ যাওয়ার পথে প্রায়ই তাকে উত্যক্ত করতো রনি নামক (সাদেকুল রহমান রনি) এক যুবক। বাণিজ্য বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী শশারানি বেশ কয়েকবার এর প্রতিবাদও করেছিল। কয়েকদিন আগে মেয়েটি কলেজ যাওয়ার সময় রনি ও তার দলবল তাকে তুলে নিয়ে যায় এবং এখানে রনি শশারানিকে ধর্ষণ করে। খবরটি জানার পর শশার পরিবার থানায় গিয়ে রনির নামে ডায়েরী করলেও পুলিশ ডায়েরী নিতে অস্বীকার করে। কারণ রনি আওয়ামী লিগের কুখ্যাত সন্ত্রাসী। এরপরই শশারানির পরিবারের উপর নেমে আসে অত্যাচার। রনি শশাকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে পরিবারটিকে চাপ দিতে থাকে, নতুবা তাদেরকে হত্যা করার হুমকি দেয়। স্থানীয় কিছু মুসলমান শশার পরিবারকে ভারতে চলে যাওয়ার জন্য বাধ্য করে। সবকিছু দেখে শশা পরিবারের লোকজনদের বাঁচাতে নিজেকে আত্মাহুতি দেয়। সন্ত্রাসী রনির কাছে গিয়ে সে আত্মসমর্পণ করে। রনি শুধু তাকে বিয়েই করেনি, জোর করে ধর্মান্তরিতও করেছে।

রীতু সিং অপহরণ দিল্লী থেকে গ্রেপ্তার ৩

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার মহালন্দি গ্রাম থেকে গত ৫ মে নিখোঁজ হয় কলকাতার বাসিন্দা রীতু সিং। কান্দি থানায় অভিযোগ দায়ের করার সাথে সাথে হাইকোর্টেও একটি মামলা দায়ের করেন নিখোঁজ এই কিশোরীর বাবা কমল সিং। তদন্তকারী জেলা পুলিশের একটি দল দিল্লীর সাহাজপুরি সবজিবাজার এলাকা থেকে কাজী মহম্মদ জহিরুদ্দিন, সফিক আলী এবং আজিমুল আনসারীকে গ্রেপ্তার করেছে। গত ২ সেপ্টেম্বর ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত, রীতু সিং অপহরণ কাণ্ডে এই পর্যন্ত মোট ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হল। এদিকে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের সূত্র ধরে পুলিশ গাজিয়াবাদ থেকে সালার থানার পিলখুণ্ডি গ্রামের নিখোঁজ এক কিশোরীকে উদ্ধার করেছে। আদালতে তোলা হলে বিচারক এই কিশোরীকে তার অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

তিন জৈশ জঙ্গি খতম কাশ্মীরে

কাশ্মীরের পুলওয়ামায় মঙ্গলবার সেনা ও সিআরপিএফের যৌথ অভিযানে জৈশ-ই-মহম্মদের তিন দুর্ধর্ষ জঙ্গি নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছে সংগঠনের এক জেলা কম্যাণ্ডারও। পুলওয়ামার রাজপোরার হানজান গ্রামে জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর পাওয়ার পরই সোমবার রাতে শুরু হয় নিরাপত্তা বাহিনী ও জৈশ জঙ্গিগোষ্ঠীর মধ্যে গুলির লড়াই। জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ, সেনাবাহিনী ও সিআরপিএফ। এদিকে, জম্মুর পাল্লানওয়ালা সেক্টরে পাক সীমান্তে ১৫০ মিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গের হদিশ মেলার খবর দিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

১৩ লক্ষ টাকার জাল নোট সহ ধৃত মুকুল মিঞা

১ সেপ্টেম্বর রাতে মালদা জেলার কালিয়াচক থানার চরি অনন্তপুর বিওপি থেকে বিএসএফ-এর জওয়ানরা ১৩ লক্ষ টাকার জাল নোট সহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে। ধৃতের নাম মুকুল মিঞা। সে কালিয়াচক থানার দুইশত বিঘা এলাকার বাসিন্দা। ২ তারিখ তাকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

পত্রিকা দপ্তর থেকে

চিনের মুসলিম চিন্তাবিদের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদে সহায়তার চার্জ গঠন

চিনের উইঘুর মুসলিম চিন্তাবিদ ও গবেষক ইলহাম তোহতির বিরুদ্ধে 'বিচ্ছিন্নতাবাদে সহায়তা'-র চার্জ গঠন করল চিন সরকার। আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাকে। তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা প্রমাণিত হলে চিনের আইন অনুসারে তার মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। তোহতি চিনের উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, তাদের উপর সরকারি বঞ্চনা ও দমন-পীড়ন ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সারা পৃথিবীর পরম্পরা মেনে চিনেও মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ ক্রমশঃ মাথাচাড়া দিচ্ছে। যার কেন্দ্র শিনজিয়াং প্রদেশ। বিগত কয়েক মাসের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা চিনা নাগরিকদের উপরে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ্যে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে। এই হামলায় বেশ কিছু চিনা নাগরিকের মৃত্যুও হয়েছে। এতে চিনের সরকার এবং চিনা নাগরিকরা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। এই পরিস্থিতিতে চিন সরকারের এই পদক্ষেপ একটি বিশেষ বার্তা বহন করছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছে। উইঘুর মুসলিমদের এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়ায় ঈদের আগের দিন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়, যাতে শতাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে উইঘুর সংগঠনগুলি দাবি করেছে। সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ৩১। এরকম একটি সময়ে তোহতি-র বিরুদ্ধে এই মামলা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

গরু চুরির অভিযোগ দুই ভাইকে গণপ্রহার

গরুচোর সন্দেহে দুই ভাইকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিল জনতা। ৩১ আগস্ট, রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উঃ ২৪ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া থানা এলাকার বাগজোলা পঞ্চায়েতের কৃত্তিপুর গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, আশঙ্কাজনক অবস্থায় নামদাল মণ্ডল এবং তার ভাই হাসানুরকে স্থানীয় রুদ্রপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নামদানের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'তিন বছর ধরে এই এলাকায় গরু চুরির ঘটনা বেড়ে চলেছে। কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। তাতে ক্ষোভ বাড়ছিল এলাকায়। শনিবার রাত আড়াইটে নাগাদ ওই দুই ভাইকে গাড়ি নিয়ে বাড়ির থেকে বের হতে দেখেন স্থানীয় মানুষ। এলাকার কয়েকজন মোটরবাইক নিয়ে পিছু ধাওয়া করেন। কিন্তু সেই সময় তাদের ধরতে পারা যায়নি।

ভোরবেলায় কৃত্তিপুর মোড়ের কাছে দুই ভাইকে দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীরা জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সে সময়ে ক্ষিপ্ত জনতা গরুচোর সন্দেহে মারধোর শুরু করে দুই ভাইকে। আরও লোক জমা হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছলে গ্রামবাসীরা ওই দুই ভাইকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেন। অবশেষে বাদুড়িয়া থানার ওসি কল্লোল ঘোষ জনতাকে শান্ত করে দুই ভাইকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান। বাদুড়িয়া থানায় গ্রামবাসীরা গরু চুরির অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই থানাতেই মারধোরের অভিযোগ দায়ের করেছে ওই দুই ভাইয়ের বাড়ির লোকজন। দু'টি পৃথক মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

"একবার কার্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত নয়-কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির ইহাই ধর্ম। পশ্চাৎপদ হইও না, উহা কাপুরুষতার পরিচায়ক। একবার কার্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা অবশ্যই সম্পন্ন করিতে হইবে, এক ইঞ্চিও আর নড়া উচিত নয়-অবশ্য ইহা কোন অন্যায় কার্যের জন্য নয়।" - স্বামী বিবেকানন্দ

পত্রিকা দপ্তর থেকে

নিয়ে নাও বাবরি মসজিদ, তৈরী করো রাম-মন্দির।

বাবরি মসজিদটি ছিল অযোধ্যায়। ভারতবর্ষের অন্য কোনো জায়গাতে নয়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষের কাছে অযোধ্যা পবিত্র ভূমি। সেদিন যদি এই সহজ কথাটা আমরা হাসিমুখে মেনে নিতে পারতাম। জায়গাটা দিয়ে দিতে পারতাম। তাহলে হাজার হাজার রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা আমাদের দেখতে হতো না। একটাই তো জায়গা অযোধ্যা। ওটা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের পবিত্রভূমি। সেইদিন আমরা বলতে পারতাম - ওগো, ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। তোমরা আমাদের আপনজন। তোমরা, আমরা বলে তো কিছু নেই। তোমরা আমাদের ভাই। আমরা তোমাদের ভাই। অযোধ্যা তোমাদের পবিত্রভূমি। নিয়ে নাও বাবরি মসজিদ। তৈরী করো রাম-মন্দির। আমরা তোমাদের হাসিমুখে বরণ করলাম। আমরাই তোমাদের সাহায্য করবো। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আজও পর্যন্ত আমরা এমনটা করতে পারলাম না। সমস্যাটাকে সমস্যার আকারে রেখে খেলা করতে শুরু করলাম। খেলা এখনও চলছে। কতদিন চলবে জানি না। ওরা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করবে। দাঙ্গা লাগলে আমাদের মৃত্যু আসবে। এইভাবে আমাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, আমরা সমস্যা সৃষ্টি করছি। সমস্যাকে টিকিয়ে রাখছি।

—(বিশ্ব অশান্তির স্বরূপ - মীর মোসার্‌রাফ আলী পৃষ্ঠা-১৩০)

হিন্দুদের ব্যাপক প্রতিক্রিয়ায় বাধ্য হয়ে দেড় লক্ষ টাকা জরিমানা দিল গোহত্যাকারী

দঃ ২৪ পরগণার সাগরদ্বীপে ধসপাড়া গ্রাম। গত ২৫ জুন শতবর্ষ পুরাতন কালীমন্দিরে উৎসর্গীকৃত একটি ষাঁড়কে চুরি করে হত্যা করে পাশের কোম্পানিঝাড় গ্রামের জনৈক শেখ মুজিবর (পিতা ঃ শেখ ইব্রাহিম)। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় স্থানীয় হিন্দুরা চড়াও হয় সেই মুসলিম গ্রামে। হিন্দুদের সেই মারমুখী রূপ দেখে ভয় পেয়ে যায় মুসলিম গ্রামবাসীরা। তারা কালবিলম্ব না করে ওই মন্দিরে এক লক্ষ টাকা জরিমানা দেয় এবং কালীমাতার নামে উৎসর্গ করার জন্য একটি ষাঁড় কিনে এনে দেয়। দঃ ২৪ পরগণা জেলায় এটি নিশ্চিতভাবে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা।

স্থানীয় মানুষের বক্তব্য, মুসলিম আগ্রাসনের দাওয়াই আইন, আদালত, পুলিশ নয়; এর একমাত্র ওষুধ পাল্টা আগ্রাসন। সাগরদ্বীপের এই ঘটনা এই তত্ত্বকেই সমর্থন করছে।

"যে বাণী একদিন সরস্বতীতীরে ঋষিগণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহার প্রতিধ্বনি নগরাজ হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও চৈতন্যের ভিতর দিয়া সমতল প্রদেশে নামিয়া সমগ্র দেশ প্লাবিত করিয়াছিল, তাহাই আবার উচ্চারিত হইয়াছে। আবার দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে; সকলে আলোর রাজ্যে প্রবেশ করুন -দ্বার আবার উদঘাটিত হইয়াছে।"

মহাপ্রয়াণে মহন্ত অবৈদ্যনাথজী

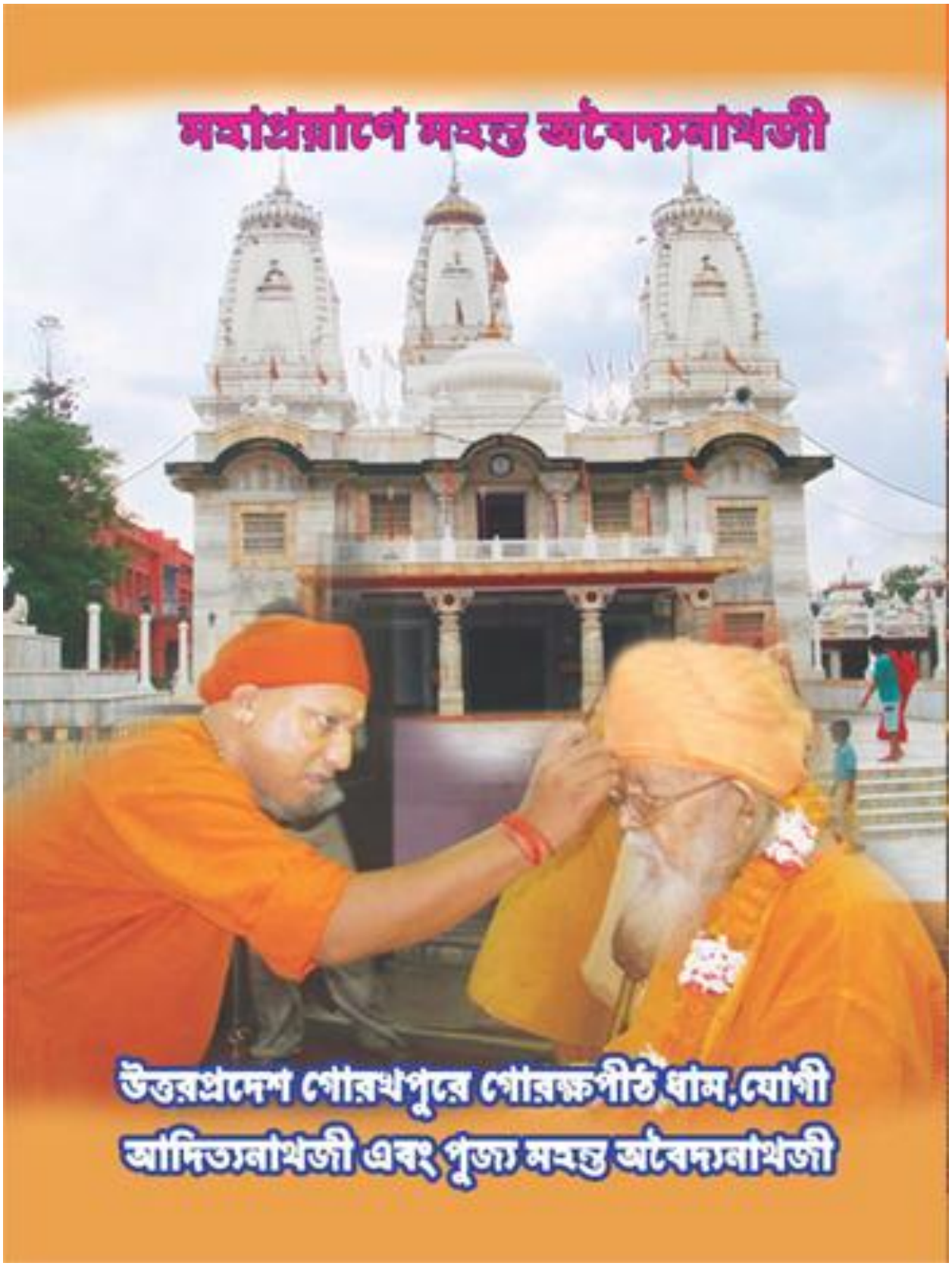

উত্তরপ্রদেশ গোরখপুরে গোরক্ষপীঠ ধাম,যোগী
আদিত্যনাথজী এবং পুজ্য মহন্ত অবৈদ্যনাথজী